লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং॥
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষ্ণাং।
তৃষ্ণার্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

হিতোপদেশ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে

engal Medical Library. 201, Cornwallis Street. Calcutta

Published by Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.
PRINTED BY N. C. PAL, "INDIAN PATRIOT PRESS,"
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

1908.

এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

উৎসর্গপত্র

সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল

সুহৃদ্বরেষু,

এই উপন্যাসখানির প্রকাশ বিষয়ে আপনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি আপনারই উৎসাহে এবং আগ্রহে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল; এবং ইহার স্থানে স্থানে আপনার হস্তচিহ্নও বিদ্যমান রহি-য়াছে। এই গ্রন্থ আপনাকে প্রেমোপঢৌকন দিলাম।

কলিকাতা
২২শে ফাল্গুন, ১৩১৪। } গ্রন্থকার।

প্রথম খণ্ড

লোভে—পাপ

লক্ষটাকা

লক্ষটাকা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষম বিপদ্

বোম্বে সহরে পথের উপরে একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখে একখানা ভাঙা চেয়ারে বসিয়া যুবক পাণ্ডুরাং অতি নিবিষ্টমনে "মুম্বই সমাচার" পাঠ করিতেছিল।

দ্বারের পার্শ্বেই একটি ছোট ঘর—ঘরের মধ্যে একপার্শ্বে একটা আল্‌মারী, মধ্যস্থলে একখানি টেবিল ও টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে তিন-চারিখানি বেণ্টউড চেয়ার, আর একখানা অপেক্ষাকৃত কিছু দামী চেয়ারের উপরে একটি লোক রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র আফিসের একমাত্র কেরাণী-পুঙ্গব হইতেছেন—সংবাদপত্রপাঠরত পাণ্ডুরাং।

সহসা সম্মুখে একজন গুজরাটী ভদ্রলোককে দেখিয়া পাণ্ডুরাং ক্ষিপ্রহস্তে কাগজখানি সরাইয়া রাখিল।

গুজরাটী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার আছেন ?"

"আছেন—আসুন।"

"আমার একটা দাঁত তুলিবার প্রয়োজন।"

"আসুন—বসুন, আমি তাঁহাকে সংবাদ দিতেছি," বলিয়া পাণ্ডুরাং নিজের চেয়ারখানি ছাড়িয়া, সেই ভদ্রলোকটিকে বসিতে দিল। তৎপরে সত্বরপদে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথায় যিনি বসিয়াছিলেন, তিনিই হইতেছেন—এই পাণ্ডুরাংএর মনিব। পাণ্ডুরাং তাঁহাকে বলিল, "একজন ভদ্রলোক দাঁত তুলিতে চায়।"

দন্ত-চিকিৎসক পার্শী জামসেদজী সৈয়দজী পাটেল আফিসে আসিয়া জানালার দিকে মুখ করিয়া প্রত্যহ জনবহুল পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার খরিদ্দারের বড়ই অভাব, সুতরাং পয়সারও সেইরূপ অপ্রতুল। মাসের মধ্যে বড় জোর দুই-একজন তাঁহার নিকটে দাঁত তুলিতে আসে।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দোরাবজী সৈয়দজী পাটেল ডাক্তারী পাশ করিয়াছেন। 'এল এম এস' লাভ করা সত্ত্বেও, দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকটেও রোগীর বড়ই অপ্রতুল, দুই ভ্রাতারই অবস্থা শোচনীয়। পয়সার অভাবে এ পর্য্যন্ত উভয়েই বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারেন নাই।

একজন খরিদ্দার মিলিয়াছে শুনিয়া জামসেদজী সোৎসাহে বলিলেন, "শীঘ্র এইখানে তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

পাণ্ডুরাং বাহিরের ঘর হইতে সেই গুজরাটী ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া আনিল। জামসেদজী উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

না বসিয়া সেই গুজরাটী ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি সৈয়দজী পাটেল—আপনিই দন্ত-চিকিৎসক ?"

"হাঁ, আমার ঐ নামই বটে।"

"সাইনবোর্ডে আপনার নাম দেখিলাম।"

"আপনি দাঁত তুলিতে ইচ্ছা করেন ?"

"হাঁ, একটা দাঁত তুলিতে ইচ্ছা করি।"

"তবে এই চেয়ারখানায় বসুন।"

"দাঁড়ান, একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার সাইন্‌বোর্ডে লেখা রহিয়াছে—যন্ত্রণাহীন দাঁত তোলা।"

"হাঁ।"

"আমি সেই রকমই চাই।"

"আপনি তাহা হইলে গ্যাস ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন?"

"আমি গ্যাস-ট্যাস জানি না, মহাশয়। যাহাতে দাঁত তুলিবার সময়ে কোন কষ্ট না হয়, তাহাই আমি চাই। তাহা যদি হয়, তবে আপনাদের এ একটা অদ্ভুত আবিষ্কার বটে।"

"হাঁ, অনেকেই তাহা বলেন।"

"তাহা হইলে লেগে যাও, ডাক্তার।"

"দু-চার মিনিট বিলম্ব করিতে হইবে।"

"আবার বিলম্ব কিসের জন্য—কি মুস্কিল!"

"আপনাকে গ্যাস লাগাইবার জন্য আর এক জন ডাক্তার ডাকিতে হইবে।"

"নিজে তুমি পার না, ডাক্তার?"

"না, তাহা নিয়ম নয়।"

"কতক্ষণ লাগিবে?"

"এই এখনই তিনি আসিবেন, ডাক্তার নিকটেই থাকেন।"

"ভাল, তাহাই হউক।"

"তবে আপনাকে আমার আগে বলা উচিত যে, ইহার জন্য আপনাকে কিছু বেশি দিতে হইবে।"

"কত বেশি দিতে হইবে?"

"দাঁত তোলার খরচার উপরে চারি টাকা বেশী দিতে হইবে।"

"তাহা হইলে মোট ?"

"আটটাকামাত্র।"

"ভাল—তাহাই। যদি আমার কোন কষ্ট না হয়, তাহা হইলে আট-টাকা দিতে আমি নারাজ নই। টাকা আমার এখন পকেট-পোরা।"

দন্ত-চিকিৎসক বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তৎ-পরে পাণ্ডুরাংকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, এখনই ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আন, বলিও একজন ভদ্রলোক গ্যাসের সাহায্যে দাঁত তুলাই-বেন, রোগী এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। শীঘ্র আসা চাই।"

পাণ্ডুরাং চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ডাক্তার দোরাবজী পাটেল শশব্যস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আগন্তুক গুজ-রাটী ভদ্রলোক বলিলেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনিই কি কষ্টনিবারক ?"

দোরাবজী হাসিয়া বলিলেন, "উপস্থিত তাহাই।"

এই বলিয়া তিনি যন্ত্রাদি বাহির করিয়া ঠিকঠাক সাজাইয়া লইলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার ভিতরে এ গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দিলে পরে কি হইবে ? এ যে দেখিতেছি, বেলুনের ব্যাপার ! কতক্ষণ গ্যাসপোরা থাকিব ?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "এক মিনিটমাত্র, সেই সময়ের মধ্যে আপনার দাঁত তোলা হইয়া যাইবে।"

"কষ্ট হবে না ?"

"কিছুমাত্র নয়। সম্ভবতঃ, কি হইতেছে, তাহা আপনি জানিতেও পারিবেন না।"

"বেশ ভাল, আজ বড় গরম বোধ হইতেছে—জামাটা খুলিয়া ফেলিলে আপনার আপত্তি নাই—কিছু অসুবিধা হইবে না ত ?"

"কিছুমাত্র নয়।"

আমি সমস্ত দিনই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—অনেক কাজ ছিল, এখন বড় ক্লান্ত হইয়াছি—আচ্ছা, জামা খোলা থাক।”

“আপনার যেরূপ ইচ্ছা।”

“হঁ, কাল আমি জাহাজে পোর-বন্দরে যাইব, সেইখানেই আমার বাড়ী; আমার দাঁতে বড় বেদনা বোধ হইতেছিল, জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইয়া গিয়াছে। এই পথে যাইতে যাইতে আপনার সাইন্‌বোর্ড দেখিলাম।”

“এইখানে বসুন—এইখানে—হাঁ—এই রকম—এইবার ঠিক হইয়াছে—”

“আঃ—ও কি—কি আপদ্!”

“ভয় পাইবেন না—কেবল এ গ্যাস—কোন ভয় নাই—মনে করুন, যেন আপনি ঘুমাইয়া পড়িতেছেন। হাঁ, বেশ হইয়াছে। ভায়াজি, ঠিক হইয়াছে, এইবার,” বলিয়া ডাক্তার সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্বর সাঁড়াসী দিয়া দাঁতটা তুলিয়া লইয়া এক গেলাস জল হাতে তুলিয়া লইলেন; তৎপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, “ভায়াজি, ভায়াজি—দেখ, দেখ—এ কি—শীঘ্র——”

ডাক্তার জানালার নিকটে বক্ষে বাহুবিন্যাস করিয়া পথের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; ভ্রাতার কথা শুনিয়া চকিত হইয়া সত্বর ফিরিলেন; তৎপরে বলিলেন, “ব্যাপার কি?”

কিন্তু তাঁহাকে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে হইল না, তিনি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া সত্বর ভ্রাতার হাত হইতে জলের গেলাস লইয়া তাঁহার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিলেন, তৎপরে বলিলেন, “ব্রাণ্ডি?”

তিনি মুখের ভিতরে গেলাস দিয়া খানিকটা ব্রাণ্ডি রোগীর মুখে ঢালিয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, “ভায়াজি, আমার অস্ত্রের ব্যাগ?”

ব্যাগ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দোরাবজী তদ্দ্বারা একটা কি ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেই গুজরাটী ভদ্রলোকের দেহে বিদ্ধ করিয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভায়াজি, শীঘ্র দরজা বন্ধ করিয়া দাও।"

জামসেদজী তখন ভীতিবিস্ফারিতনেত্রে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলেন। দোরাবজী রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, মৃত্যুই হইয়াছে। বোধ হয়, হাজারের মধ্যে একজনেরও এরূপ হয় না। অদৃষ্ট—অদৃষ্ট—আমাদের অদৃষ্ট——"

দন্ত-চিকিৎসক ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এখন উপায় ?"

অপরে নীরব। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "পুলিসকে সংবাদ দেওয়া যায় ?"

"তাহাতে কি ফল হইবে ?"

"এরূপ হইলে পুলিসে সংবাদ দেওয়া নিয়ম।"

"নিয়ম ! কোন্‌টা নিয়মমত এখানে হইতেছে ? এখন পুলিস মানে আমাদের সর্ব্বনাশ।"

"আমরা কিরূপে এ বিপদ্ কাটাইব ?"

"কাটাইতেই হইবে—ভাবিতে দাও——

(ক্ষণপরে) "কিছু ভাবিয়াছ ?"

"হাঁ, কিছু।"

"কি স্থির করিলে ?"

"এসপ্ল্যানেডের বাগানে রাত্রে কেহ থাকে না ?"

"না।"

"সেই পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর সেইখানে এই মৃতদেহটা রাখিয়া আসা।"

"ভয়ানক !"

"কেন? এ মরিয়া গিয়াছে! ইহার দেহ পুলিসকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; সুতরাং এই ঘরে ইহার দেহ না পাইয়া, না হয় এস্-প্ল্যানেডের বাগানেই পাইল। ইহাতে ইহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; অথচ এখানে ইহাকে পাইলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।"

"নিশ্চয়ই—একেবারে সর্ব্বনাশ!"

তাঁহাদের অবস্থা একেই ভাল নহে, ইহার উপরে পুলিস-হাঙ্গামা হইলেই হইয়াছে আর কি! উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। উপায় কি?

কিয়ৎক্ষণ পরে দন্ত-চিকিৎসক বলিলেন, "ইহাকে গাড়ী করিয়া ইহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া যায় না কি?"

"হাঁ, তাহা যাইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কি সর্ব্বনাশ হইবে না?"

"তাহা হইলে ইহাকে——"

"এখন এই আল্‌মারীর মধ্যে ইহাকে পূরিয়া রাখিয়া দেওয়া যাক্; ধর—হাঁ, এই রকম হইলেই চলিবে।"

তখনই তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া আগন্তুকের দেহ একটা আল্‌মারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "এখন এই পর্য্যন্ত, পাণ্ডুরাং যেন কিছু না জানিতে পারে। সে কখন বাড়ী যায়?"

"পাঁচটার সময়ে।"

"পাঁচটা ত প্রায় বাজে। সে আমার ওখানে আছে, এখনই এখানে আসিবে; সে যেন মনে করে যে, গুজরাটী ভদ্রলোকটা চলিয়া গিয়াছে। সে পাঁচটার সময়ে চলিয়া যাক, তাহার পর আমি আসিব।'

তাহাই হইল। পাণ্ডুরাং আসিয়াই ছুটি পাইয়া চলিয়া গেল। তখন ডাক্তার নিজের আফিস বন্ধ করিয়া ভ্রাতার আফিসে আসিলেন। তিনি বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরের ঘরে আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপদে সম্পদ

ডাক্তার বলিলেন, "ভায়াজি, আমি এ বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি। এখন মনে হইতেছে, ইহাকে এস্‌প্ল্যানেডের বাগানে ফেলিয়া দেওয়া ভয়ানক কাজই হইবে বটে; যাহা হউক, প্রথমে দেখা যাক্, এই লোকটা কোথায় থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে ইহার বাড়ীতেই রাখিয়া আসা যাইবে।"

"ইহা বিপজ্জনক হইবে না?"

"হাঁ, তবুও ইহাই আমাদের করিতে হইবে। অনেক রাত্রে ইহাকে ইহার বাড়ীর দরজায় বসাইয়া রাখিয়া আসিব।"

"ইহা কি সম্ভব?"

"প্রথম কথা—এই লোকটা কোথায় থাকিত। যদি সহরের বাহির হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই এ কাজ করা যাইবে, কেহ দেখিতে পাইবে না। একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দরজায় দাঁড় করাইয়া কোচ্‌ম্যানকে কিছু আনিতে পাঠাইয়া দিলেই হইবে। তুমি ঘোড়াটা ধরিবে, আমি মৃতদেহটা অন্ধকারে গাড়ীতে তুলিয়া দিব।"

"লোকটার মুখে শুনিয়াছি, পোর বন্দরে যাইতেছিল।"

"তাই ত—ঠিক কথাই ত মনে পড়িয়াছে। আমার এতক্ষণ তাহা মনেই ছিল না—দেখা যাক, ইহার পকেটে কোন কাগজ-পত্র আছে কি না। তাহা হইলে হয় ত ইহার ঠিকানাটা জানা যাইতে পারে।"

তখন তাঁহারা আল্‌মারী খুলিয়া সেই মৃতদেহের জামার পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। তন্মধ্যে অনেক-গুলির শিরোনামায় লিখিত আছে, "হরকিষণ দাস—গিরগাম—বম্বে।"

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এই লোকটা গিরগামে বাস করিত। পত্রগুলি কলবাদেবী রোডের পার্শী উকীল মেটার নিকট হইতে আসিয়াছে। এই পত্রগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারা যায়, কেন হর-কিষণ দাস পোর-বন্দর হইতে বোম্বাই আসিয়াছিল, সুতরাং দুই ভায়ে মিলিয়া পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পড়িয়া এইরূপ বুঝিলেন যে, বোম্বাইয়ে হরকিষণ দাসের এক মাতুলানী ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী, হরকিষণ দাস। মাতুলানীর মৃত্যু-সংবাদ মেটার নিকট হইতে পাইলে হরকিষণ দাস পত্রোত্তরে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বলে। পরে সমস্ত বিক্রয়ের সংবাদ পাইলে হরকিষণ দাস লিখিয়াছিল, "আমি স্বয়ং যাইতেছি, গিয়া টাকা লইব।"

শেষ তারিখের একখানি পত্রে মেটা লিখিয়াছেন, "সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। সত্বর আসিয়া টাকা লইয়া যাইবেন।" এই পত্র পাঠ করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহি-লেন। এক লক্ষ টাকা! তাঁহারা মৃতদেহের পকেটে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অবশেষে কনিষ্ঠ পাটেল ধীরে ধীরে বলিলেন, "এক—লাখ—টাকা!" বলিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে দুই হাতে মৃতদেহের বস্ত্রাদির ভিতরে সেই টাকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পকেটে জাহাজের টিকিট তিন খানা পাইলেন, তন্মধ্যে দুইখানা বাক্সের টিকিট, সেই বাক্স দুইটা জাহাজের ষ্টেষণে জমা আছে। অপরখানি যাত্রীর টিকিট।

তখন জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "নিশ্চয় লক্ষটাকা এই বাক্সে আছে ?"

তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন, "এমন মূর্খ কে আছে যে, এক লাখ টাকা এই রকম করিয়া রাখিবে ?"

"তাহা হইলে গিরগামের বাসায় আছে ?"

"না, সে সম্ভাবনা কম।"

ডাক্তার মৃতদেহের কোমরে হাত দিয়া একটা লম্বা থলী দেখিতে পাইলেন। তিনি সেটা খুলিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার ভিতরে তাড়া বাঁধা অনেকগুলি নোট। তিনি সেই থলীর ভিতর হইতে সর্ব্বাগ্রে নোটগুলি টানিয়া বাহির করিলেন, একশতখানা হাজার টাকা নোট। ঠিক এক লাখ টাকা।

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কথাবার্ত্তার কোন প্রয়োজন ছিল না। উভয়ে উভয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দন্ত-চিকিৎসক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "লাখ টাকা !"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, এখন আমাদেরই হইবে।"

"নম্বরি নোট—ভাঙান দায়।"

"উপায় করিতে হইবে।"

"কি উপায় ?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

"কি ভাবিতেছ ?"

"জাহাজের লোক ইহাকে চিনিবে না, টিকিট সহরের আফিসে কিনিয়াছে।"

"না, তাহারা চিনিবে না।"

"কাল ইহার জাহাজে উঠিবার কথা ছিল।"

"তাহা ত বুঝিলাম।"

"ভায়াজি, আমরা চিরকাল গরীবই থাকিতে পারি—অথবা সহজে বড়লোক হইতে পারি।"

এই বলিয়া তিনি নোটগুলি নাড়িতে লাগিলেন; উভয়েরই চক্ষু ক্রমে যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। অর্থলোভে অতি নিরীহ লোকও অতি শীঘ্রই ভয়াবহ মূর্ত্তিধারণ করিয়া থাকে।

সহসা ডাক্তার বলিল, "আমাদের একজনকে যাইতে হইবে।"

"কোথায়?"

"ইহার নাম লইয়া পোর-বন্দরে।"

"প্রয়োজন?"

"বিশেষ প্রয়োজন বই কি। আগে এইটাকে সরাইতেই হইবে।"

এই বলিয়া ডাক্তার অঙ্গুলী দিয়া মৃতদেহটা দেখাইয়া দিল। দিয়া বলিল, "তাহার পর ইহার নাম ধরিয়া পোর-বন্দরে নামিয়া নিরুদ্দেশ হইতে হইবে। অবশেষে যখন এ বিষয় লইয়া গোল উঠিবে, তখন এখানে কাহাকে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

"বুঝিতেছি।"

"যখন আমাদের একজন জাহাজে রওনা হইবে—অপরে ক্রমে ক্রমে নোটগুলি ভাঙাইতে থাকিবে। যতদিন তাহার কথা না প্রকাশ হইতেছে, ততদিন এই সকল নোট ব্যাঙ্কে কেহ বন্ধ করিবে না, সুতরাং নোট ভাঙাইবার যথেষ্ট সময় আছে।"

"হাঁ, কিন্তু এই লাসটা এখন কোথায় সরান যায়?"

"জাহাজে লইয়া যাইতে হইবে।"

"সে কি?"

"আর অন্য উপায় নাই। আমিই জাহাজে যাইব। আর তুমি এদিকে

নোটগুলি ভাঙাইবার চেষ্টায় থাক। আমি দুইটা বাক্সে এই মৃতদেহটা লইব, পরে সুবিধামত জাহাজ হইতে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা পাইব।"

"দুইটি বাক্সে এত বড় একটা মানুষের মৃতদেহ ?"

"হাঁ, আমি শরীর-ব্যবচ্ছেদ করিতে জানি—আমি ডাক্তার——"

"কি ভয়ানক ! তুমি তাহা হইলে——"

মধ্যপথে বাধা দিয়া ডাক্তার কহিল, "হাঁ, অত ভয় পাইলে কাজ হয় না। ঐ ঘরে যাও, আমি যন্ত্রাদি আনিয়াছি।"

অপরে সত্বর তথা হইতে পলাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার ছোট ভায়ের ন্যায় তাহার মনের বল নাই।

ক্ষণপরে ডাক্তার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "যাও, একখানা গাড়ী করে গিয়া এখনই দুইটা বাক্স কিনিয়া আন, দেরি করিও না।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ বাক্স আনিতে ছুটিল।

এদিকে ডাক্তারের কাজ চলিল। বিশেষতঃ ছুরি চালাইতে ডাক্তার খুব সুদক্ষ ছিল।

বাক্স আসিলে ডাক্তার, হরকিষণ দাসের খণ্ড খণ্ড দেহের প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে খবরের কাগজে মুড়িয়া দুই বাক্সে বোঝাই করিল। তৎপরে বলিল, "আমি সুবিধামত জাহাজ হইতে এই দুইটা বাক্স জলে ফেলিয়া দিতে পারিব, কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"তবে——"

"তবে আবার কি—ভয় করিলে কোন কাজই হয় না। সময়ে খুনের কথা প্রকাশ পাইবে ; কিন্তু আমাদের কেহ কোনক্রমেই কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না। বিচলিত হইও না, এদিকে সুবিধামত তুমি নোটগুলি ভাঙাইবার চেষ্টা করিতে থাক।"

"কিন্তু——"

"আর 'কিন্তু' নাই—পরে টাকা হাতে আসিলে সব 'কিন্তু'ই মিটিয়া যাইবে। বোধ হয়, এক মাসের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিতে পারিব। পথে জাহাজ কেবল মার্‌ভি-বন্দরে একবার থামিবে, ইহার মধ্যে আমি চাই যে, তুমি নোটগুলি ভাঙাইয়া ফেলিবে।"

"কিরূপে ভাঙাইব—ব্যাঙ্কে যাইব ?"

"না—না—একটা অন্য স্থানে গিয়া একখানা ভাল রকম বাড়ী ভাড়া লও, সেইখানে কিছুদিন থাকিয়া দালালদের মারফৎ খুব ভাল ভাল সেয়ার কিনিতে থাক, সেয়ারের দামে এই সকল নোট দিয়ো, পরে সেয়ারগুলো বেচিবার সময় যদি দাম কিছু কম হয়, তাহাতেও বেশী কিছু আসে-যায় না।"

"তাহাই করিব।"

"এখন তুমি বাড়ী যাও।"

"আর তুমি ?"

"আজ রাত্রে আমি এইখানেই থাকিব।"

"এই ঘরে—এই মৃতদেহের সঙ্গে ?"

"ইহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি এখন কিছুতেই এই মৃতদেহ দৃষ্টির বাহিরে রাখিতে পারি না। সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলে তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"

"তুমি—তুমি—এখানে ঘুমাইতে পারিবে ?"

"খুব।"

"তাহা হইলে আমি ?"

"তুমি খুব সকালে আসিবে, তুমি আসিলে আমি হরকিষণ দাস হইয়া জাহাজে গিয়া উঠিব।"

এই বলিয়া সে একরূপ জোর করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

পর দিবস অতি প্রাতে দন্ত-চিকিৎসক নিজের আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার চেহারা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সে সমস্ত রাত্রের মধ্যে একবারও নিদ্রিত হইতে পারে নাই।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আসিতে দেখিয়া ডাক্তার, মৃত হরকিষণ দাসের পরিত্যক্ত পোষাক পরিধান করিয়া গুজরাটী হইল। তাহার পর বাক্স দুইটা গাড়ীর উপরে উঠাইয়া পোর-বন্দরে রওনা হইল। তথা হইতে পোর-বন্দরের জাহাজ ছাড়িবে।

ডাক্তার জাহাজে উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। হরকিষণ দাসের পকেটে পূর্ব্বেই জাহাজের টিকিট পাওয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইহার জন্য তাহাকে এখন আর স্বতন্ত্র এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পদে লোভ

উকীল বাইরামজী মেটা এক সঙ্গে কখনও লক্ষ টাকা দেখেন নাই—অনেকেই দেখেন নাই। তবে লক্ষ টাকা হাতে পাইলে অনেকেই তাহা নিজস্ব করিবার জন্য প্রলুব্ধ হন। টাকা জিনিষটার এই আকর্ষণ অত্যন্ত খারাপ, সন্দেহ নাই!

উকীল মেটাও প্রলুব্ধ হইলেন; হইবার কারণও অনেক। তিনি মদ্যপ—জুয়াড়ী—তাঁহার আপাদমস্তক দেনায় ডুবিয়া গিয়াছে।

দেনা হইলে লোকের কোন জ্ঞান থাকে না ; উচ্চ শিক্ষিত হইলেও ক্রমে তাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। মেটা সাহেবেরও তাহাই হইয়াছে। ক্রমে তাঁহার পশার নষ্ট হইতেছে—উকীল সমাজে তিনি হেয় ও হতশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সময়ে হঠাৎ হরকিষণ দাসের বৃদ্ধা মাতুলানীর মৃত্যুতে এই একটা সুযোগ তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। বহুকাল হইতে তিনি এই বৃদ্ধার কাজ-কর্ম্ম দেখিতেন ; বৃদ্ধাই তাঁহার একমাত্র মক্কেল ছিল।

বৃদ্ধার সম্পত্তি হইতে তাঁহার বেশ দু পয়সা হইবে, ইহাই তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন ; মনে করিয়াছিলেন, হরকিষণ দাস কখনই দূর পোর-বন্দর হইতে এখানে আসিবে না। তিনি শুনিয়াছিলেন, সে চাষ-বাস করিয়া খায়, একরূপ মাতব্বর চাষা মাত্র, কখনও সহর দেখে নাই—সহরে আসে নাই, তাহাকে ঠকান বড় কঠিন হইবে না।

পরে যখন মেটা পত্র পাইয়া জানিলেন যে, হরকিষণ দাস সশরীরে আসিতেছেন, তখন তাঁহার ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। হরকিষণ দাস উপস্থিত হইলে উকীল মেটা আরও নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে—হরকিষণ দাস নিতান্ত সাদা-সিদে লোক নহে, তাহাকে ঠকানও সহজ কাজ নয়। নিদারুণ নৈরাশ্যে তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

হরকিষণ বোম্বাই না আসিলে বেশ দু পয়সা হইত ; কিন্তু সে আসিয়া পড়ায় মেটা টাকা লইতে সাহস করিলেন না। একেই তাঁহার বদনাম যথেষ্ট, তাহার উপরে হরকিষণ যদি কোনক্রমে জানিতে পারে যে, তিনি তাহার কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা হইলে সে তাঁহার রক্ষা রাখিবে না, বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া করিবে না, তাঁহার নামে তৎ-ক্ষণাৎ পুলিসে নালিশ করিবে।

এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ টাকা হিসাব ঠিক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ; কিন্তু তিনি মনে মনে অন্য একটা মৎলব আঁটিতে লাগিলেন। স্থির করিলেন, এ টাকা হাতে পাইয়া হাত হইতে কিছুতেই যাইতে দেওয়া হইবে না : মেটা মনে মনে যাহা প্রতিজ্ঞা করেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য তিনি অন্য কোন দিকেই আর দৃক্‌পাত করেন না।

তিনি হরকিষণের সহিত তাঁহার জাহাজের টিকিট কিনিয়া দিতে যাইতেছিলেন। হরকিষণ আগামী কল্য পোর-বন্দর অভিমুখে রওনা হইবেন। উভয়ে একত্রে যাইতেছিলেন, সহসা হরকিষণ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "উকীল, এত কি ভাবিতেছ ?"

মেটা চমকিত হইলেন। তৎপরে বলিলেন, "কই, কিছুই নয়।"

"জাহাজের টিকিটের আফিস কত দূর ?"

"এই যে—ঐ দেখা যাইতেছে।"

তাঁহারা উভয়ে জাহাজের আফিসে আসিয়া শুনিলেন যে, সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কেবিন খালি আছে, ইহাতে দুইজন যাইতে পারেন। হরকিষণ দাস একখানা টিকিট কিনিলেন।

আফিস হইতে বাহির হইয়া মেটা হরকিষণ দাসের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজের আফিসের দিকে চলিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হরকিষণ দাস দন্ত-চিকিৎসক খুঁজিতে লাগিলেন।

কিন্তু এদিকে মেটা ঠিক নিজের আফিসে ফিরিলেন না। হরকিষণ দাস দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তিনি আবার সেই জাহাজের আফিসে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "আমার বন্ধু আমাকে আবার পাঠাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তাঁহার কেবিনে আর কেহ যায় ; তিনি অন্য টিকিটখানাও কিনিতে ইচ্ছা করেন।"

"এ উত্তম কথা," বলিয়া জাহাজের কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট দাম লইয়া অপর টিকিটখানিও দিলেন। মেটা টিকিট লইয়া আফিস হইতে সহাস্ত মুখে বাহির হইলেন।

যে কেবিনে হরকিষণ দাস যাইবেন, মেটা সেই কেবিনের অন্য টিকিট সংগ্রহ করিলেন। তিনিও হরকিষণ দাসের সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন, তবে তাহার পোর-বন্দর পর্য্যন্ত যাইবার ইচ্ছা ছিল না। পথে জাহাজ মার্‌ভি-বন্দরে থামিবে; তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া সেই মার্‌ভি-বন্দরেই নামিয়া পড়িবেন, মনে মনে এইরূপই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ বন্দোবস্ত করিলেন,তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস,সেই লক্ষ টাকা ঘুরিয়া ঠিক আবার তাঁহার হাতেই আসিয়া পড়িবে; কিন্তু লোকে যাহা ভাবে, নিয়তি তাহার বিপরীত ঘটাইয়া দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশের প্রয়োজন

মেটা নিজ চেহারা ও বেশের পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিলেন। তাঁহার দাড়ী-গোঁফ ছিল না। তিনি এক ভাল পরচুলওয়ালার দোকানে গিয়া গোঁফ ও দাড়ী সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে দাড়ীতে লাল রং লাগাইলেন। তিনি মুসলমানের পোষাক পরিয়া যখন এই দাড়ী-গোঁফে সজ্জিত হইলেন, তখন তাঁহাকে পার্শী উকীল মেটা বলিয়া চিনিবার যো রহিল না। যে দেখিত, সেই মনে করিত, তিনি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সওদাগর।

জাহাজ প্রাতেই ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাড়িতে পারে নাই। এতক্ষণ জাহাজে থাকিলে পাছে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে, সেই ভয়ে মেটা তৎক্ষণাৎ জাহাজ হইতে তখনই নামিয়া আসিলেন। জাহাজ ছাড়িবার একটু আগে তিনি পুনরায় আসিয়া জাহাজে উঠিলেন। এমন কি আর একটু দেরী হইলে আর জাহাজ পাইতেন না।

তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কেবিনে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার সাহস হইল না—আর সে ইচ্ছাও ছিল না। জাহাজের খানসামা আসিয়া তাঁহাকে আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "অসুখ হইয়াছে—কিছু খাইব না।"

জাহাজ চলিল। পথে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময়ে সমুদ্র বড় গম্ভীর ও উদারভাব ধারণ করিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার—তাহাতে সমুদ্রের নীলবক্ষে শুভ্রফেণ কি সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে! সুনীল সমুদ্রের ফেণকেই তাহার অপূর্ব্ব হাস্যের মত দেখাইতেছে। অন্ধকার নিবিড় হওয়ায় ক্রমে জগৎ ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার পর মনোহর চন্দ্রোদয়—সমুদ্র রৌপ্যবর্ণে রঞ্জিত হইল—তখন চক্ষু যত দূর ইচ্ছা প্রসারিত করিয়া দাও, কেবল সমুদ্র আকাশ জ্যোৎস্না, আর জ্যোৎস্না আকাশ সমুদ্র—এই তিন ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই। এদিকে জাহাজের ভিতরে প্রত্যেক কেবিনে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মেটা সেই আলোকে কেবিনটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন—কি জানি, হরকিষণ দাস আসিলে পাছে তাঁহাকে চিনিতে পারেন।

অনেক রাত্রে হরকিষণ দাস কেবিনে শয়ন করিতে আসিলেন,

এতক্ষণ তিনি উপরে ডেকে ছিলেন। মেটা তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইয়া আছেন।

তাঁহার সহযাত্রী ঘুমাইয়াছেন দেখিয়া হরকিষণ আলো নিভাইয়া দিয়া শয়ন করিলেন।

মেটা স্পন্দিতহৃদয়ে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্রমে অপরের নাসিকাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, তখন মেটা ধীরে ধীরে উঠিল; আগে হইতেই এক সুশাণিত ছোরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ইহা নিজ বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মেটা একখানি তোয়ালেও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মেটা তোয়ালে ও ছোরা লইয়া নিঃশব্দে উঠিল। সে পূর্ব্ব হইতেই কেবিন বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, সুতরাং অন্ধকারে তাহাকে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য বিশেষ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। মেটা সহসা সুপ্ত হরকিষণের মুখে বামহস্তে রুমালখানা চাপিয়া ধরিয়া শাণিত ছোরা তাঁহার কণ্ঠের উপরে চালাইয়া দিলেন।

হরকিষণ কেবল সামান্যমাত্র গোঁ গোঁ করিলেন, একবার তাঁহার দেহ কম্পিত হইল, তাহার পর সকলই নিস্তব্ধ! মেটার কার্য্য সফল হইয়াছে।

মেটা খানিকক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিল, সে দম বন্ধ করিয়া এই ভয়াবহ কাজ করিতেছিল, এক্ষণে দম ঠিক করিয়া লইল।

সে মৃতের মুখের উপরে তোয়ালেখানা ঢাকিয়া দিল, কে স্বহস্তে ছেদন করা, দ্বিখণ্ড মৃতদেহ এরূপভাবে নির্জ্জনে দেখিতে সাহস বা ইচ্ছা করে? মেটা মৃতদেহের মুখ তোয়ালে ঢাকিয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিল। জ্বালিয়া দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে নিম্নে রক্ত পড়ে নাই, তবে বিছানাটা রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে, মেটা তখনই তাহা চাপাচুপি দিয়া

ঠিক করিয়া ফেলিল। ইহাতে তাহার করতল রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল—তাহা হউক, পার্শ্বস্থ জলপাত্রে সে রক্ত অনায়াসেই ধুইয়া ফেলা যাইতে পারিবে। এবং মশারিটা একটু টানিয়া দিলে সকলেই মনে করিবে যে, লোকটা ঘুমাইতেছে। তাহার পর সে মারভি-বন্দরে নামিয়া গেলে, অন্ততঃ জাহাজ বহুদূর না গেলে এ যে কেন এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছে—তাহার সন্ধান কেহ করিবে না, সুতরাং তাহার কোন বিপদ্ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এখন নিশীথ রাত্রি, সকলেই নিদ্রিত।

সে জানিত যে, হরকিষণ দাস নোটগুলি একটা লম্বা থলীতে পূরিয়া কোমরে বাঁধিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কোমরে হাত দিয়া মেটা দেখিল যে, কোমরে সে নোটের থলী নাই।

মেটা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তবে সে নোট কোথায়? তবে কি হরকিষণ দাস কোন ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে। না, নিশ্চয়ই তাহা হইলে এই বাক্সে আছে। সৌভাগ্যের বিষয় বাক্স খুলিয়া দেখিবার যথেষ্ট সময় আছে।

মেটা তাড়াতাড়ি তাহার পকেট খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে চাবি পাইয়া তৎক্ষণাৎ একটা বাক্স খুলিয়া ফেলিল; দেখিল, তাহাতে কাগজে মোড়া কি একটা বড় দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার গন্ধটাও কেমন একরকম।

এ সব দেখিবার তাহার কিছুমাত্র সময় ছিল না, সে তাড়াতাড়ি আর একটা বাক্স খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, তাহাতেও কাগজে মোড়া কয়েকটা কি রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটা গোল, অন্য চারিটা লম্বা।

সে লম্বা একটা তুলিয়া লইয়া ক্রোড়ের উপরে রাখিয়া তাহার উপরের কাগজগুলি সন্তর্পণে খুলিতে আরম্ভ করিল।

কাগজ খুলিলে বাহির হইল, এক মানুষের হাত। তাড়াতাড়ি এবার গোলাকার মোড়কটা খুলিল, তাহার ভিতরে একটা মানুষের ছিন্ন

মস্তক—কি ভয়ানক! মেটা নিজের মুখের শব্দ বন্ধ করিবার জন্য নিজেই নিজের মুখ চাপিয়া ধরিল। অন্যান্য কাগজের মোড়কে কি আছে, তাহা দেখিতে তাহার আর সাহস হইল না। সে বুঝিল, হরকিষণ দাস বোম্বাই সহরে কাহাকে হত্যা করিয়া তাহারই মৃতদেহ এইরূপে বাক্স-বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিতেছি, ভগবান্ তাহার দণ্ড আমার হস্তেই দিলেন; কিন্তু লাখ টাকা কোথায়—তাহার সকল পরিশ্রম বৃথা হইল? অনর্থক হরকিষণকে খুন করিলাম, নিশ্চয়ই সে টাকা অন্যত্রে কোথায় রাখিয়াছে, এটা স্থির—তাহার সঙ্গে টাকা নাই। সে তখনই সেই ছিন্নমস্তকটা উল্টাইয়া দেখিল, "কি ভয়ানক—এ যে ঠিক হরকিষণের মুখ দেখিতেছি—একি স্বপ্ন না কি! মেটা ক্ষিপ্রবেগে এবার হরকিষণ দাসকে দেখিতে গেল, মশারি তুলিয়া সেই মৃতদেহের মুখ হইতে রুমাল টানিয়া তুলিয়া লইল—এ কি! এ আবার কে?

এই সময়ে জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মেটা বুঝিল, জাহাজ মারভি-বন্দরের নিকটস্থ হইয়াছে, আর সময় নাই। যেমন করিয়া হউক, পলাইতেই হইবে। মেটা তাড়াতাড়ি সেই মৃতদেহের বাক্স দুইটা বন্ধ করিয়া ফেলিল। পরে আলো নিভাইয়া মৃত ব্যক্তির মুখের দিক্কার মশারি টানিয়া দিয়া বেশ-বিন্যাস করিল। তৎপরে যেন কিছুই হয় নাই, এইরূপভাবে উপরে ডেকে আসিল, সেখানে জাহাজের একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায় আসিলাম?"

"মারভি।"

"এখানে কতক্ষণ জাহাজ থাকিবে?"

"একঘণ্টা—ডাক দিতে হইবে, ডাক লইতে হইবে। ঐ ছোট ষ্টীমার আসিতেছে। ঐ ডাক লইয়া যাইবে, তাহার পর আবার ডাক লইয়া আসিবে।"

"তীরে গিয়া সহরটা দেখিতে যাইতে পারা যায় ?"

"হাঁ, যাইতে চান ?"

"ক্ষতি কি, জায়গাটা দেখিয়া আসি।"

"কেবল একঘণ্টা জাহাজ থামিবে।"

"ও—যথেষ্ট সময়।"

ক্রমে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার আসিয়া বড় জাহাজের গায়ে লাগিল। তখন জাহাজে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। মার্‌ভির যাত্রিগণ মাল-পত্র লইয়া ষ্টীমারে উঠিতে লাগিল। সেই গোলমালে মেটাও উঠিয়া পড়িল। কেহ তাহাকে দেখিল না, সে ষ্টীমার হইতে নামিয়া মেটা মারভি-সহরে নিরুদ্দেশ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার

দূরে এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়া মেটা দেখিল যে, জাহাজ ছাড়িয়া গেল। তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহা হইলে খুনের কথা এখনও জাহাজে প্রকাশ পায় নাই। অন্ততঃ নয়টা পর্য্যন্ত কেহ মৃতব্যক্তির অনুসন্ধান করিবে না, ততক্ষণ জাহাজ অনেক দূরে চলিয়া যাইবে, সে সময়ে কাপ্তেন এতদূর ফিরিয়া আসিতে কোন মতেই সম্মত হইবেন না, সুতরাং তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল, জাহাজ ফিরিল না।

মেটা জাহাজে বোম্বে ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ বিবেচনা করিল না ; সে তাহার দাড়ী-গোঁফ সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে টাকা ছিল, পার্শী-পোষাক সংগ্রহ করিল, তৎপরে স্থলপথে বোম্বে রওনা হইল।

যাহা হউক, সে অবশেষে বোম্বে গিয়া উপনীত হইল। জাহাজে সে বাক্সের মধ্যে যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

যে লোকটাকে ভ্রমক্রমে সে খুন করিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে আবার কোনক্রমে হরকিষণ দাসকে খুন করিয়াছিল।

মেটার মত লোকেরও প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাহার হত্যাকারী তাহারই দেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বাক্সে লইয়া যাইতেছিল, নিশ্চয়ই সে-ই তাহার নোট চুরি করিয়াছিল ; কিন্তু মেটা ভাবিল, সে নোট তাহার নিকট যে নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, নিশ্চয়ই লোকটা এখানে কোন লোকের নিকটে নোটগুলি ভাঙাইবার জন্য রাখিয়া সে হরকিসণের দেহ কোন গতিকে বিদায় করিবার জন্য পোরবন্দর যাইতেছিল।

তাহা হইলে নোট বোম্বেতেই আছে। এই নোটের নম্বর হরকিষণ দাস জানিত, আর মেটা জানে। এখন হরকিষণ দাস আর নাই, এই নোট এখন চোরের হাতে পড়িয়াছে, সুতরাং ইহার নম্বর বন্ধ করিয়া দিলে, ইহা আর কেহ ভাঙাইতে পারিবে না।

মেটা ভাবিল, "যেদিক দিয়া হউক, নোট আবার আমার হাতে আসিবে। ভাঙাইতে আসিলে ধরা পড়িলে নোট আমিই পাইব, কারণ নোট যে আমি হরকিষণ দাসকে দিয়াছিলাম, তাহা সে আর আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। তাহার মামীর বিষয় যাহারা কিনিয়াছে, তাহারা এ নোট আমাকেই দিয়াছিল ? যেদিক দিয়া হউক, নোট যায়

কোথায় ? চোর যখন দেখিবে, তাহার নোট ভাঙাইবার কোন উপায় নাই, যখন তাহার সঙ্গীর খুনের কথা জানিতে পারিবে, তখন আমার নিকট হইতে কিছু লইয়া নোটগুলি ফেরৎ দিবার চেষ্টা করিবে—আমি ইহাতে সম্মত আছি।"

এইরূপ নানা কথা মেটা মনে মনে আন্দোলন করিল; কিন্তু কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

তাহারই ন্যায় আর একজন বোম্বে সহরে দিবারাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে দন্ত-চিকিৎসক জামসেদজী।

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গিয়াছিল, সে পোর-বন্দরে পৌঁছিয়াই তাহাকে পত্র লিখিবে; কিন্তু জাহাজ অনেক দিন পৌঁছিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার কোন পত্র এ পর্য্যন্ত আসে নাই। তাহার ডাক্তার ভ্রাতার ন্যায় তাহার হৃদয়ে তেমন বল ছিল না—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিবারাত্রি কাম্পত হইতে লাগিল।

নোটগুলি সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে, তাহা তাহার ভাই বলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু জামসেদজী সাহস করিয়া কিছুই করিতে পারিল না। ডাক্তার যাইবার সময় নোটগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, নোটগুলি এখনও সেইখানেই আছে।

এদিকে মেটা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নোট বন্ধ করাই স্থির করিল, ইহাতে ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে—খুনের সহিত এই লাখ টাকার নোট জড়িত; কিন্তু ভয় করিলে কোন কাজই এ সংসারে হয় না, যথাসময়ে সে নোট বন্ধ করিবার জন্য পত্র লিখিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ রমণী কে

যে জাহাজের কথা আমরা বলিতেছি, যে জাহাজ হইতে একটু পূর্ব্বে মেটা পলাইয়াছে, সহসা সেই জাহাজের এক প্রান্ত হইতে শব্দ হইল, "মানুষ জলে পড়িয়াছে।"

সত্য সত্যই একজন জলে পড়িয়াছে। একটি বালিকা জাহাজের রেলে বুক দিয়া সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গলীলা দেখিতেছিল, ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে সমুদ্রে পড়িয়াছে। নিকটে তাহার মা বুক চাপ্‌ড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

তাহার পর মুহূর্ত্তেই আবার এক চীৎকারধ্বনি উঠিল, এবার একটি পুরুষ সত্বরহস্তে জামা জুতা খুলিয়া ফেলিয়া প্রায় বালিকার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ইহাতে জাহাজে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাপ্তেন জাহাজ থামাইয়া ফেলিলেন, নিমেষমধ্যে একখানা নৌকা নামাইয়া দেওয়া হইল। পাঁচ-সাতজন বলবান্ নাবিক সবলে দাঁড় টানিয়া সেইদিকে চলিল।

যিনি পরে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রবক্ষে পড়িয়াছিলেন—তিনি বালিকা জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বেই গিয়া তাহাকে ধরিয়াছিলেন, তাহাকে তখনই তুলিয়া লইয়া সাঁতার দিতেছিলেন। নৌকা গিয়া তাঁহাদের উভয়কেই তুলিয়া লইল।

নিমজ্জনে তাঁহাদের দুইজনের কাহারই অধিক অনিষ্ট হয় নাই। জননী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে লইয়া কাঁদিতে লাগিল। জাহাজ সুদ্ধ লোক সেই পরোপকারী যুবকের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; নিকটবর্ত্তী একজনকে বলিলেন, "আমার বাক্সে কাপড় জামা আছে, আনিয়া দাও।"

সকলেই তখন এই পরোপকারী যুবকের সেবা ও আদেশপালন করিতে ব্যস্ত, একজন তাঁহার জন্য কাপড় ও জামা আনিতে ছুটিল। তাঁহাকে লইয়া জাহাজ সুদ্ধ লোক বোধ হয়, সমস্ত দিন ব্যস্ত হইয়া থাকিত; কিন্তু এই সময়ে জাহাজে আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় তাঁহার কথা তখন একদম চাপা পড়িয়া গেল।

বেলা দশটা বাজে, অথচ একটা কেবিনে একজন শয়ন করিয়া আছে, উঠে না দেখিয়া একজন খানসামা গিয়া তাহাকে ডাকিল। পুনঃ পুনঃ ডাকায় তাহার কোন উত্তর না পাইয়া সে গিয়া মশারি সরাইল, তৎপরে এক লম্ফে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আত্মহত্যা—আত্মহত্যা!"

দেখিতে দেখিতে জাহাজময় এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল! সকলের মুখেই আত্মহত্যা!

কিন্তু জাহাজের ডাক্তার মৃতদেহ দেখিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কাপ্তেন বলিলেন, "কি, আত্মহত্যা নয় কি?"

"না, খুন।"

"খুন!"

"হাঁ।"

"আর কে এ কেবিনে ছিল। সে লোক কোথায়? খোঁজ তাকে।"

তখন একজন বলিল, "সে মারভি দেখিতে গিয়াছিল, তাহার পর ফিরিয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না।"

তখন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, জাহাজে সে নাই। সে মারভি গিয়াছিল, ফিরে নাই। কাপ্তেন বলিলেন, "তাহা হইলে সে পলাইয়াছে—এখন আর উপায় নাই, আমি এখন কিছুতেই এখান হইতে আর মারভি ফিরিয়া যাইতে পারি না।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহা হইলে খুনীকে পলাইবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় না কি ?"

"তাহা কি করিব ? এখান হইতে ফেরা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পোরবন্দরে গিয়া পুলিসের হাতে কেস দেওয়া যাইবে, এখন যাহা যাহা হইয়াছে, ডাক্তার তুমি তাহার একটা রিপোর্ট লিখিয়া রাখ। কতক্ষণ মরেছে, বলিয়া বোধ হয়।"

"দশ-বার ঘণ্টা।"

"আমরা সন্ধ্যার সময়ে পোর-বন্দরে পৌঁছিব—ততক্ষণ যেমন আছে, তেমনই [illegible], কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া শীলমোহর [illegible]।"

[illegible] হইল। দুই মৃতদেহ সেই কেবিনে বন্ধ রহিল। তবে জাহাজের লোকেরা কেবল একটি মৃতদেহের কথাই জানিতে পারিল।

পোর-বন্দরে জাহাজ পৌঁছিলে কাপ্তেন জাহাজ হইতে কাহাকেও নামিতে দিলেন না। পুলিসকে সংবাদ পাঠাইলেন।

পুলিস অনতিবিলম্বে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল; কিন্তু জাহাজস্থ কাহারও উপরে কোন সন্দেহ করিবার কিছু নাই দেখিয়া সকলকে নামিতে অনুমতি দিল। তখন তাহারা হুড়ামুড়ি করিয়া জাহাজ হইতে নামিতে আরম্ভ করিল।

একটি স্ত্রীলোক ঘাটে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে যাত্রীদিগকে দেখিতেছিল; কিন্তু সকলে চলিয়া গেল, সে যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; বোধ হয়, তাহাকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে তবুও নড়িল না।

একজন কর্ম্মচারীর দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িল, সে তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছ ?"

"সব যাত্রী কি নামিয়াছে ?"

"হাঁ, তবে দুই-একজন আছে।"

"তাহা হইলে আমি যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি তিনি এখনও জাহাজে আছেন ?"

"না।"

"কেন ?"

"তুমি যাঁহার অপেক্ষা করিতেছ, তাঁহার নাম কি ?"

"হরকিষণ দাস, তিনি কি এখনও জাহাজে আছেন ?"

"এখানে অপেক্ষা কর, আমি অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিতেছি।"

এই বলিয়া সে ছুটিয়া কাপ্তেনের নিকটে গিয়া বলিল, "একটি স্ত্রীলো[illegible]

"কি হইয়াছে ?"

"সে একজন যাত্রীর জন্য আসিয়াছে।"

"বল, সকলেই নামিয়া গিয়াছে।"

"সে হরকিষণ দাসকে চায়।"

"কি—কি ?"

"হরকিষণ দাস।"

পুলিস-কর্ম্মচারী তথায় বসিয়াছিলেন। তিনি সত্বর উঠিয়া বলিলেন, কোথায় সে ?"

"এইদিকে আসুন।"

পুলিস-কর্ম্মচারী সেই স্ত্রীলোকটির নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি একজন যাত্রীর জন্য আসিয়াছেন ?"

"হাঁ, হরকিষণ দাস। তিনি কি এখনও জাহাজে আছেন ?"

"দেখুন—একটা কথা——"

"আপনি কে ?"

"আমি পুলিসের লোক।"

"পুলিস ! সব প্রকাশ হয়ে প'ড়েছে—সে গ্রেপ্তার হয়েছে ?"

পুলিস-কর্ম্মচারী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভাবিলেন, "তাহা হইলে কেবল খুন নয়, আরও গভীর রহস্য আছে।"

রমণীও তাহার ভুল বুঝিল, সামলাইয়া লইবার জন্য বলিল, "তিনি—তিনি—তিনি কি এখনও জাহাজে আছেন ?"

"হাঁ।"

"আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি কি ?"

"আপনি তাঁহার কেহ হন ?"

"স্ত্রী।"

"আসুন।"

এই বলিয়া তিনি তাহাকে লইয়া জাহাজের মধ্যে আসিলেন।

রমণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কই তিনি ?"

"ব্যস্ত হইবেন না—আপনার স্বামী এই জাহাজে বোম্বাই হইতে চড়িয়াছিলেন——"

"তাহা আমি জানি—এখনও তিনি কি জাহাজে রহিয়াছেন ? কোথায় আছেন ?"

"তাঁহার মৃতদেহ——"

"কি—কি——"

"তিনি মারা গিয়াছেন।"

"মারা গিয়াছেন !"

এই বলিয়া রমণী বসিয়া পড়িল—মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল, পুলিস-কর্ম্মচারী তাহার মুখে-চোখে জল দিয়া বলিলেন, "অধীর হইতে নাই—মরণ-বাঁচন সকলেরই আছে, একটু স্থির হইয়াছেন? মৃতদেহ দেখিতে চাহেন—ভাল—দেখা আবশ্যক, সেনাক্ত হওয়া চাই। আসুন, এই-দিকে, এই ঘরে—ঐখানে আছে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তুলসী বাক্স

রমণী কেবল একদৃষ্টে মৃতদেহ দেখিল, তৎপরে পাগলের ন্যায় হাসিয়া উঠিল, তৎপরেই ক্রন্দন করিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিতা হইল।

সে তাহার স্বামীকেই মৃত দেখিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু দেখিল, আর এক ব্যক্তি। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, সে ডেকের উপরে শয়ন করিয়া আছে। রাত্রি হইয়াছে, তাহার নিকটে কেহ নাই, জাহাজের মধ্যে মধ্যে আলো জ্বলিতেছে? সে নড়িল না, এখন কি করা উচিত, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। একটা কিছু ভয়ানক হইয়াছে! তাহার স্বামীর নাম ধরিয়া কেহ এই জাহাজে আসিতেছিল, কে তাহাকেই বা খুন করিল! সে তাহার স্বামীর সকল কথাই জানিত। তাহাই তাহার এত ভয়।

হরকিষণ দাস যথার্থই চাষা ছিলেন, নাম-সই ব্যতীত তাহার আর অধিক বিদ্যা ছিল না। তাহার চিঠীপত্র লিখিবার জন্য, তাহার হিসাব-পত্র কাজ-কর্ম্ম দেখিবার জন্য সে গোপালরাম দাস নামে এক শিক্ষিত

যুবককে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছিলেন। গোপালরাম ও তাহার স্ত্রী তুলসী বাঈ তাঁহার বাড়ীতেই থাকিত।

যখন মেটা, হরকিষণ দাসের মামীর মৃত্যু-সংবাদ ও তাহার সম্পত্তির কথা জানাইয়া পত্র লিখিল, তখন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া গোপাল দাস সে পত্র গোপন করিয়া ফেলিল—সে পত্রের কথা হরকিষণ দাসকে কিছুই বলিল না। রাত্রে তুলসী বাঈর সহিত পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সে-ও তাহাতেই সায় দিল। লাখ টাকা! অনায়াসেই বড় লোক হইতে পারা যাইবে, হরকিষণ দাস ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিবে না। আর কিরূপেই বা জানিবে?

উভয়ে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গোপাল দাস মনিবের নিকট হইতে ছুটি লইল। তাহার পর সে হরকিষণ দাস নাম লইয়া বোম্বাই রওনা হইল।

তুলসী বাঈ এ সমস্তই জানিত। গোপালরাম দাস বোম্বাই হইতে তাহাকে দুই-তিনখানা পত্র লিখিয়াছিল। শেষ পত্রে সে লিখিয়াছিল, "কাজ উদ্ধার হইয়াছে, কল্যকার জাহাজে রওনা হইব।" তাহাই তুলসী বাঈ জানিতে পারিয়াছিল যে, গোপাল দাস মনিবের নাম লইয়া এই জাহাজে আসিবে, তাহাই সে-ও একদিনের ছুটি লইয়া পোর-বন্দরে আসিয়াছিল। এখন জাহাজে গোপাল দাস আসে নাই, তাহার নাম ধরিয়া আর একজন আসিয়াছে, সে-ও খুন হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

জাহাজস্থ সকলে জানিয়াছে যে, সে তাহার স্বামীকে মৃত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সে কি বলিবে? মৃত ব্যক্তিকে তাহার স্বামী বলিয়া সেনাক্ত করিতে পারে না, করিলে টিকিবে না। অনুসন্ধানে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে। অনুসন্ধান হইলে সে-ও তাহার

স্বামী যে কি কাণ্ড করিয়াছে, তাহাও সব প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন উপায় ?

তুলসী বাঈ মূর্চ্ছা যাইবার অজুহতে জাহাজের ডেকের উপরে পড়িয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কি করা উচিত। সহসা সে কি একটা মৎলব ঠিক করিয়া সবেগে উঠিয়া বসিল। পলানই উচিত ; নতুবা পুলিসের হাতে পড়িলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যখন সকলে ভাবিতেছিল যে, সে অজ্ঞান হইয়া আছে, সেই সময়ে তুলসী বাঈ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে জাহাজ হইতে নামিয়া পলাইল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে সহরে অন্তর্হিত হইল। তুলসী বাঈ জাহাজ হইতে পলাইয়া সেই রাত্রেই তাহার মনিবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। হরকিষণ দাস ঠিক পোর-বন্দর সহরে বাস করিতেন না ; সহর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে তাঁহার বাড়ী। তাঁহার বাড়ীর চারিদিকেই বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, এ সমস্তই তাঁহার অনেক লোকজন লইয়াই তাঁহার কার-কারবার।

সংসারে তাঁহার সম্বল একমাত্র কন্যা—হিঙ্গন বাঈ। বহুদিন হইল, হরকিষণ দাসের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে,তিনি পিতা হইয়া মাতৃস্নেহ ঢালিয়া হিঙ্গনকে মানুষ করিয়াছেন। হিঙ্গনের এখন প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়স হইয়াছে। হিঙ্গন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী—ঝল্‌মলে রূপ ; যে একবার তাহাকে দেখে, সহসা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারে না—লাবণ্যপ্রবাহে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিসিক্ত। তাহার বয়স ষোড়শ হইলেও অতি শৈশবের অম্লান লাবণ্যটুকু যেন তাহাকে এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; মুখখানিতে তাহা যেন এখনও ফুটিয়া আছে। সেই চাঞ্চল্যপূর্ণ শৈশবের ন্যায় এখনও তাহার চক্ষু কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। এখনও

তাহার বিবাহ হয় নাই। মনের মত পাত্র না পাওয়াই তাহার বিবাহ না হইবার কারণ, বিশেষতঃ হরকিষণ দাস তাহাকে ছাড়িতেও সম্পূর্ণ সম্মত নহেন। গুজরাটে সাধারণতঃ ইহাপেক্ষা কম বয়সে কোন বালিকার বিবাহ হয় না, হরকিষণ দাস তাহার কন্যাকে এখনও ক্ষুদ্র বালিকা মনে করিয়া থাকেন।

তুলসী বাঈ পলাইলে জাহাজের লোকেরা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথায়ও তাহার কোন সন্ধান পাইল না। পর দিবস পুলিস মৃতদেহ ও তাহার বাক্স দুইটি লইয়া গেল। তখন বাক্স খুলিয়া তাহারা আর একজনের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া মহা বিস্মিত হইল। অনেক অনুসন্ধান হইল; কিন্তু এই দুই খুনের কোনই সন্ধান হইল না।

তুলসী বাঈ ফিরিয়া হরকিষণ দাসের বাড়ী আসিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোকও হরকিষণ দাসের বাড়ীতে আসিলেন। ইনিও এই জাহাজে বোম্বাই হইতে পোর-বন্দরে আসিয়াছিলেন।

ইহার নাম জয়বন্ত লালজী ভাই—ইনি যুবক, সুপুরুষ সুশিক্ষিত; কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহার ন্যায় অলসপ্রকৃতি এ সংসারে দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কিছুতেই কোন কাজ-কর্ম্ম করিতে চাহিতেন না। বোম্বাই থাকিলে আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে ভাবিয়া, তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে বোম্বাই হইতে বিদায় করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। হরকিষণ দাস তাঁহাদের নিকটে পরিচিত ছিলেন। দূরে পোর-বন্দরে তাঁহার চাষবাসে গেলে জয়বন্ত আর অলসভাবে থাকিতে পারিবেন না ভাবিয়া, তাঁহারা হরকিষণ দাসের নামে এক পত্র দিয়া তাঁহাকে পোর-বন্দরে পাঠাইয়া দিলেন।

জয়বন্তের পিতামাতা জীবিত নাই, আত্মীয়স্বজন এতদিন তাঁহার

ভরণপোষণ, শিক্ষার খরচ-পত্র চালাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার এক পয়সাও ছিল না, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

জয়বন্ত ইহাতে বড় দুঃখিত হইলেন না। নানা দেশ দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার বরাবরই ছিল, তিনি পোর-বন্দরে যাইবার প্রস্তাবে দুঃখিত না হইয়া বরং মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহার যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা সমস্তই একটা বাক্সের মধ্যে পূরিয়া জাহাজে আসিয়া, পথে তিনি একটা সৎকার্য্য করিয়া যাত্রী-দিগের নিকটে ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। চলন্ত জাহাজ হইতে বালিকা পড়িয়া গেলে, তিনিই কেবল সমুদ্রবক্ষে লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাহার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠক তাহা অবগত আছেন।

যাহা হউক, যথাসময়ে তিনি হরকিষণ দাসের বাড়ীতে উপস্থিত হই-লেন। তখন অন্য কোন কাজ হাতে ছিল না। তুলসী বাঈর স্বামী ছুটি লইয়া গিয়াছিল, হরকিষণ দাস তাঁহাকে তাহারই কাজে নিযুক্ত করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিঙ্গন বাঈ

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন হরকিষণ দাস কন্যাকে ডাকিলেন, "হিঙ্গন, এদিকে এস।"

"কি বাবা ?" বলিয়া বায়ুপ্রবাহে একখণ্ড ক্ষুদ্র পুষ্পের মত ছুটিয়া আসিয়া হিঙ্গন বাঈ পিতৃসম্মুখে দাঁড়াইল।

পিতা বলিলেন, "বসো আমার কাছে।"

হিঙ্গন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল। সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি জানি, তুমি আজ আমাকে বকিবে।"

হরকিষণ দাস স্নেহ-কোমল হাস্যে হিঙ্গনের মুখের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া বলিলেন, "বকিব, কিসে জানিলে ?"

"তোমার ঐ রকম মুখ দেখিলেই আমার বড় ভয় হয়।"

"না, আমি বকিব না।"

"আমি জানি, বাবা আমায় বকে না।"

"তবে অন্য কথা আছে।"

"কি কথা, বাবা ?"

"বিশেষ কথা।"

"আমি কি করিয়াছি, বাবা ?"

"এখনও কিছু কর নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে করিতে পার, তাহাতে তোমাকে চিরজীবনের মত দুঃখী হইতে হইবে।"

"কি বাবা ?"

"জয়বন্ত এখানে প্রায় দুই মাস আসিয়াছে—সে ইহার মধ্যে তোমায় ভালবাসে, তাহা দেখিতে পাও। তাহাতে তাহার দোষ নাই, তোমায় যে দেখিবে, সে-ই ভালবাসিবে।"

"বাবা!"

"সে ভালবাসুক, তাহাতে কিছু আসে-যায় না, তুমি কি তাহাকে ভালবাস?"

হিঙ্গনের মুখ লজ্জায় কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। হিঙ্গন অবনতনেত্রে পিতার পদপ্রতি চাহিয়া বলিল, "তিনি লোক ভাল——"

"বাহিরে দেখিতে ভাল লোক সন্দেহ নাই—লেখাপড়া জানে—বোম্বাই সহরে শেখা—সে সব স্বীকার করি; কিন্তু কেবল উপরে চাকচিক্য থাকিলেই জিনিষ ভাল হয় না।"

"বাবা, এখানে কথা কহিবার মত লোক কে আছে—তাই কথা কই?"

"তা হতে পারে।"

"তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছ, এখানে যাহারা আছে, তাহারা কেবল চাষবাসই জানে, আর কিছুই জানে না।"

"তা স্বীকার করি।"

"ইনি শিক্ষিত——"

(বাধা দিয়া) "সব স্বীকার করি, তবে ইহার সিকি পয়সাও নাই।"

"নাই থাকুক।"

"সংসারে টাকাই সব।"

"তা হতে পারে, কিন্তু আমি তা মনে করি না।"

"হাঁ, বুঝিয়াছি।"

"কি বুঝিয়াছ, বাবা?"

"না, কিছু নয়। তুমি জয়বন্তকে পছন্দ কর?"

হিঙ্গনের মুখ আবার সেইরূপ লাল হইয়া উঠিল; সে নতনেত্রে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

হিঙ্গনকে অধোমুখে নীরব থাকিতে দেখিয়া হরকিষণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি কন্যাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন। কোন বড়লোকের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হিঙ্গনের ভাব দেখিয়া তাঁহার সে ইচ্ছা হৃদয়ে মিলাইয়া গেল।

হিঙ্গন বলিল, "বাবা, তুমিও ত তাঁহাকে খুব ভালবাস?"

"হাঁ, কিন্তু এই দুই ভালবাসায় অনেক প্রভেদ আছে, বেটি!"

হিঙ্গন কোন কথা কহিল না। লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিল।

হরকিষণ দাস বলিলেন, "বোম্বাই হইতে আমার কোন পরিচিত লোক জয়বন্তকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছে। জয়বন্তের এক পয়সাও নাই, সেখানে সে অলস হইয়া যাইতেছিল, তাহাই তাহারা তাহাকে আমার নিকটে কাজ-কর্ম্ম শিখিতে পাঠাইয়াছে—যদি সে এখানে কিছু রোজগার করিতে পারে।"

"ভালই ত—তিনি এখানে পরিশ্রম করিতেছেন।"

হরকিষণ দাস হতাশ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি ভাল করিতে গিয়া মন্দ করিতেছেন। তিনি যতই জয়বন্তকে দরিদ্র-সন্তান প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, হিঙ্গন ততই তাহার দোষভাগটা গুণের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

হরকিষণ অবশেষে স্পষ্ট বলিলেন, "হিঙ্গন, তুমি এখন কত সুখে আছ, তোমার কোন অভাব নাই? মনে কর, জয়বন্তের মত একজন গরীবের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে তোমার কি ভয়ানক কষ্ট হইবে?"

বাবা, গরীব যে চিরকালই সেই রকম গরীব থাকিবে, ইহার এমন মানে কি আছে ?”

“পরের কথা পরে আছে।”

“তা হতে পারে, এখানে তিনি খুব পরিশ্রম করিতেছেন।”

“তাও স্বীকার করি, কিন্তু এখান হইতে গিয়া সে মাসে কি রোজগার করিতে পারে—খুব বেশি হইলে পঞ্চাশ টাকা।”

“এ বাবা, তোমার অন্যায় কথা। কোন্ মানুষের কখন কি হয়, কে বলিতে পারে ?”

“গোপালরাম ছুটি লইয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহাকে তাহার কাজ দিতে পারিয়াছি, না হইলে ইহাকে লইয়া আমি কি করিতাম ?”

“তিনি ভালই কাজ করিতেছেন।”

“গোপালরাম ফিরিয়া আসিলে আমি কি করিব, জানি না। আমার মনে হয়, এ এখানে না আসিলেই ভাল ছিল।”

হরকিষণ দাস আর কিছু বলিলেন না; কন্যাকে অন্য কাজে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, “গোপালরাম ফিরিয়া আসিলে বাঁচি, সে ফিরিয়া আসিলেই ইহাকে বিদায় করি। কি আপদে পড়িলাম !”

হায় গোপালরাম ! তাহার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ পুলিস অনেকক্ষণ পোরবন্দরে জ্বালাইয়া দিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

রমণী না রাক্ষসী

প্রায় তিন মাস গত হইল, তুলসী বাঈ স্বামীর কোন সন্ধান পাইল না। সে স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তাহার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অথচ সে তাহার মনের কথা কাহাকেই খুলিয়া বলিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তথাপি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই।

তাহার মনে ক্রমে ধারণা হইয়াছে যে; তাহার স্বামী আর জীবিত নাই, জীবিত থাকিলে সে যেখানেই থাকিবে, নিশ্চয়ই তাহাকে সংবাদ দিবে। টাকার জন্যই তাহার প্রাণ গিয়াছে। স্বামী লিখিয়াছিল যে, সে লাখ টাকা হস্তগত করিয়াছে। নিশ্চয়ই অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে খুন করিয়া সে টাকা আত্মস্বাৎ করিয়াছে। সে কে? তাহার নাম ধরিয়া আর একজন লোক জাহাজে আসিতেছিল; কিন্তু তাহাকেও কে খুন করিয়া পলাইয়াছে।

সে জানিত, যুবক জয়বন্ত সেই জাহাজে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভয়ে তাঁহাকে তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় নাই। সে যতই এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সে উন্মাদিনীর মত হইল।

সে একদিন জয়বন্তের একখানি কাপড় দেখিয়াই প্রকৃত উন্মত্তা হইয়া গেল। সে কাপড়খানি দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল, পুনঃ পুনঃ

কাপড়খানি দেখিতে লাগিল, তাহার পর মনে মনে বলিল, "এ আমার স্বামীর কাপড়, এই আমার নিজের হাতের চিহ্ন দেওয়া রহিয়াছে। ও! এতদিনে বুঝিয়াছি, এই জয়বন্তই আমার স্বামীকে খুন করিয়াছে; নতুবা তাহার কাপড় এ জয়বন্তটা পাইবে কিরূপে?"

এ বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে দৃঢ় হইল। এত দৃঢ় হইল যে, তাহার মন হইতে আর সমস্ত কথাই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন সে মনে মনে জয়বন্তকে কিরূপে হত্যা করিবে, তাহাই দিবারাত্রি ভাবিতে লাগিল। রাত্রে তাহার ঘুম হইত না, সে সমস্ত রাত্রি মনে মনে এই বিষয় লইয়া তোলাপাড়া করিত। শেষে সে একটা উপায় স্থির করিল। একদিন সে জয়বন্তকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

জয়বন্ত বলিলেন, "কি কথা?"

তুলসী বলিল, "অত চেঁচিয়ে নয়—আস্তে।"

স্বর নীচু করিয়া জয়বন্ত একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন—কি হইয়াছে?"

"হিঙ্গন তোমায় বলিয়াছে (নীরবে)——"

(সাগ্রহে) "কি বলিয়াছে?"

"পড়ো গোয়ালের পাশে কুয়াতলায় তোমায় ডাকিতেছে।"

"পড়ো গোয়ালঘর! সেখানে সে কি করিতেছে?"

"তা আমি জানি না বাপু, তোমার ইচ্ছা হয় যাও, না হয় না যাও।"

"না, রাগ কর কেন? আমি এখনই যাইতেছি।"

"এ কথা কাহাকে বলিতে সে বারণ করিয়াছে।"

"কাহাকেও বলিব না—ভয় নাই," বলিয়া সত্বরপদে জয়বন্ত গোয়াল ঘরের দিকে চলিলেন।

এই গোয়ালঘরে এখন গরু থাকিত না—এটা পড়িয়া ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। বড় কেহ সেইদিকে যাইত না। সেখানে একটা পুরাতন কূপ আছে বটে; কিন্তু সেটাও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল আছে কি না, তাহারও বিশেষ সন্দেহ আছে।

জয়বন্ত এ স্থান জানিতেন মাত্র, কিন্তু কখন এদিকে আসেন নাই। এখানে এই নির্জ্জন স্থানে হিঙ্গন আসিয়াছে, ভাবিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন! তিনি জানিতেন, হিঙ্গন বাড়ী ছাড়িয়া কখন বেশী দূরে যাইত না।

প্রেম সর্ব্বদাই অন্ধ। জয়বন্ত এ সম্বন্ধে অধিক কোন আলোচনা করিলেন না। হরকিষণ দাস পাছে জানিতে পারেন বলিয়া, তিনি এদিকে-ওদিকে কিয়ংক্ষণ ঘুরিয়া দূরবর্ত্তী সেই পড়ো গোয়ালঘরের দিকে চলিলেন। কোনদিকে কেহ নাই, চারিদিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কোন দিকে কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। এদিকে কখনই কেহ আসিত না।

গোয়ালঘরটি পড়িয়া প্রকাণ্ড আবর্জ্জনা স্তূপের মত হইয়া আছে; একপার্শ্বে একটি কূপ আছে, কূপের চারিপার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীর ভাঙিয়া গিয়াছে। জয়বন্ত সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, "তবে কি আমার দেরি হইয়াছে—আমার দেরি হওয়ায় হিঙ্গন বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে? নতুবা তাহাকে অবশ্যই এখানে দেখিতে পাইতাম। তুলসী বাঈ কি মিথ্যাকথা বলিল? ইহাতে তাহার স্বার্থ কি?"

তিনি কূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন; সহসা গোয়ালঘরের ভগ্ন স্তূপের অপর পার্শ্ব হইতে কে তীরবেগে আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে প্রচণ্ডবেগে এক ধাক্কা মারিল। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না, একেবারে কূপের মধ্যে সশব্দে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

তাঁহার পরম সৌভাগ্য, সে সময় কূপের মধ্যে অর্দ্ধ কর্দ্দমাক্ত জল ছিল ; নতুবা তিনি হত না হইলেও হাত পা ভাঙিতেন। কাদা ও জলে পড়িয়া তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এই ভয়াবহ ব্যাপারটায় তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ক্ষণপরে উপরে কাহার কণ্ঠস্বরে তাঁহার চেতনা হইল।

তিনি উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি অন্ততঃ তিরিশ-চল্লিশ হাত নীচে পড়িয়াছেন। তিনি যেখানে রহিয়াছেন, সে স্থানে ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখিবার উপায় নাই। তবে উপরে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে দিনশেষের ম্লান আলো দেখা যাইতেছে।

আবার সেই কণ্ঠস্বর, প্রথমে তিনি কে কি বলিতেছে, বুঝিতে পারিলেন না ; পরে বুঝিলেন, কে ডাকিতেছে, "জয়বস্ত !"

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে তুমি ? তুমি যে-ই হও, শীঘ্র একটা দড়ী ফেলিয়া দাও—আমার প্রাণরক্ষা কর, উপরে উঠিয়া সব——"

তাঁহার কথা শেষ হইতে-না-হইতে কে উপরে একবার অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। তৎপরে কঠিনকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "জয়বস্ত, তুমি জাহাজে আমার স্বামীকে খুন করিয়াছিলে, সেইজন্য আমি তোমার প্রাণ লইলাম। ঐখানে থাক—ধীরে ধীরে মর, অনাহারে—না খাইয়া—ধীরে ধীরে সুখের মরণ মর—থাক—থাক—থাক এইখানে চিরজীবনের মত।"

জয়বস্ত তাহার স্বর আর শুনিতে পাইলেন না। বুঝিলেন, এ স্বর তুলসী বাঈএর—রাক্ষসী তাঁহাকে মৃত্যুমুখে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

তিনি বুঝিলেন, এখান হইতে সহস্র চীৎকার করিলেও কেহ তাঁহার স্বর শুনিতে পাইবে না। বিশেষতঃ এদিকে কেহ আসে না। তাঁহার রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই। তিনি উপর হইতে চল্লিশ হাত

নীচে কূপের ভিতরে রহিয়াছেন, কিরূপে উঠিবেন? উঠিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদশ্রুতি হইতে লাগিল। এ বয়সে এ অবস্থায় কে মরিতে চাহে? তাঁহার বিবেচনাশক্তি লোপ পাইল। তিনি বহুক্ষণ সেই কর্দ্দম ও জলের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

জয়বন্ত আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় যেন একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; তথাপি ভাবিতে লাগিলেন, "তুলসী বাঈ বলিয়াছে, জাহাজে তাহার স্বামীকে আমি খুন করিয়াছি—কি ভয়ানক দোষারোপ! কিন্তু জাহাজে প্রকৃতই খুন হইয়াছে, তাহা হইলে জাহাজে তাহার স্বামীই খুন হইয়াছে, দেখিতেছি। কিন্তু কে তাহার স্বামী? দুইজন খুন হইয়াছে। যাহার গলা কাটা—বা যাহার খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে? তাহা হইলে তুলসী বাঈর স্বামী গোপালরাম সম্বন্ধে কোন গুরুতর রহস্য আছে—আচ্ছা থাক, যদি আমি এ যাত্রা বাঁচিতে পারি, তবে এ সব বিষয় আলোচনা করিবার অনেক অবসর পাইব; কিন্তু বাঁচিবার আশা আর কই? দেখিতেছি, অনাহারে এইখানে মরিতে হইবে।"

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার চোখে বিশ্বের প্রলয়ান্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। হায়—এইরূপ অসহায় অবস্থায় অনাহারে তাঁহাকে মরিতে হইবে, সে মৃত্যু কি ভীষণ!

দশম পরিচ্ছেদ

পরিত্রাণ

জয়বস্ত বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি ; তিনি উঠিলেন, যদি কোন একটা উপায় থাকে ; কিন্তু চল্লিশ হাত নিম্ন হইতে কিরূপে উপরে উঠা সম্ভব ?

যদি কূপের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙা থাকে, তাহা হইলে সেই ভগ্ন স্থানগুলি ধরিয়া বা পা লাগাইয়া তিনি উপরে উঠিলেও উঠিতে সক্ষম হইতে পারেন ; কিন্তু ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ; তবুও তিনি একবার উঠিয়া চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু এটা ইঁদারা, চারিদিক গাঁথা, বহুকাল হইতে জল থাকায় চারিদিকের প্রাচীর এত মসৃণ হইয়াছে যে, তাহাতে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় এ প্রাচীর বহিয়া উপরে উঠিবার কোনই আশা নাই।

জয়বস্ত হতাশ হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। আবার স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন ; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কি এই কূপের মধ্যে পড়িয়া তিনি অনাহারে মারা যাইবেন ! ভগবান্ তাঁহার অদৃষ্টে কি এমন ভয়ানক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহাকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন !

তিনি আবার উঠিলেন। সহসা তাঁহার মনে একটা কথা উদিত হওয়ায় তিনি উৎসাহ ও আবেগে প্রায় আত্মহারা হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এত বড় কূপের ভিতরে নামিবার জন্য কতকগুলি কড়া

থাকা সম্ভব, এরূপ কূপের প্রাচীরে প্রায় লৌহনির্ম্মিত কড়া লাগান থাকে, এই কড়া অবলম্বনে লোকে নীচে নামিয়া আসিয়া কূপ পরিষ্কার বা মেরামত করিয়া আবার উপরে উঠিতে পারে। এ রকম গভীর ও প্রকাণ্ড ইঁদারায় নামিবার-উঠিবার অন্য উপায় নাই।

এত বড় ইঁদারায় কি কড়া থাকিবে না? খুব সম্ভব আছে। এই ভাবিয়া তিনি সত্বর উঠিলেন। অন্ধকারে আবার হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি কূপের প্রাচীর ধরিলেন। তৎপরে প্রাচীর ধরিয়া তিনি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনখানে তিনি কড়া দেখিতে পাইলেন না।

তিনি হতাশ হইয়া, কূপের প্রাচীরে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিয়া পড়িলেন—সহসা পৃষ্ঠে তাঁহার কি ঠেকিল—হাত দিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, একটা লোহার কড়া, সহসা তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন।

অন্ধকারে আর কড়া আছে কি না, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু যখন একটা রহিয়াছে, তখন মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কতকগুলা আছে। কিন্তু অন্ধকারে কড়া দেখিতে না পাইলে উপর হইতে আবার নীচে পড়িবার সম্ভাবনা—ইহাতে বিপদ আছে, হাত পা ভাঙিবার সম্ভাবনাও আছে; কিন্তু এই কূপের মধ্যে অনাহারে ধীরে ধীরে, তিল তিল করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় মরিতে হইবে! তাহাপেক্ষা একেবারে মরা ভাল। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, চেষ্টা করিয়া একবার দেখিতে হইবে।

জয়বন্ত কাপড় ভাল করিয়া আঁটিয়া পরিয়া লইলেন। তৎপরে সেই কড়াটায় পা দিয়া, বাম হস্তে প্রাচীরে ভর করিয়া উপরের কড়া খুঁজিতে লাগিলেন। উপরে সমব্যবধানে আরও অন্যান্য কড়া ছিল, খুঁজিতে কষ্ট হইল না। তিনি দক্ষিণ হস্তে আর একটা কড়া ধরিলেন।

এইরূপে অতি কষ্টে, অতি সাবধানে কড়া ধরিয়া ধরিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর জয়বন্ত উপরে উঠিলেন। দেখিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—শোভনা প্রকৃতির মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন।

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, অবসন্নভাবে সেই অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া পড়িলেন। মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলে মানুষের প্রাণে যে ভাব হয়, তাহা যিনি কখনও সে অবস্থায় না পড়িয়াছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না। কিয়ৎক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিয়া জয়বন্ত গৃহের দিকে ফিরিলেন। পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, "প্রথমে তুলসীর সম্মুখে যাইতে হইবে; দেখি, হঠাৎ আমাকে সে দেখিয়া কি করে? সে জানে, আমি কূপের ভিতরেই আবদ্ধ আছি। অথবা পড়িয়াই মরিয়া গিয়াছি।"

এই ভাবিয়া মনে মনে হাসিয়া জয়বন্ত হরকিষণ দাসের বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে যেখানে তুলসী বাঈ থাকিত, সেইদিকে আসিলেন। তাহার ঘরের জানালা উন্মুক্ত ছিল, তিনি দেখিলেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। উন্মুক্ত জানালা দিয়া আলোকশিখা বাহিরের অন্ধকার বক্ষে উজ্জ্বলভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। জানালার পার্শ্বে গিয়া মাথা তুলিয়া জয়বন্ত দেখিলেন, তুলসী বাঈ চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া আছে। জয়বন্ত জানালায় ঘা দিয়া একটা শব্দ করিলেন, অমনি তুলসী তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। তৎপর সে বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "ভূত—ভূত—ভূত——"

তাহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। জয়বন্তও সম্মুখদ্বার দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গোলযোগ শুনিয়া হরকিষণ দাসও অন্যান্যের ন্যায় তুলসী বাঈর বাড়ীর দিকে চলিলেন। সেখানে জয়বন্তকে দেখিয়া হরকিষণ দাস বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সন্ধ্যা হইতে আমি তোমাকে খুঁজিতেছি।"

জয়বন্ত তুলসী বাঈকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ পাগল হই-য়াছে, দেখিতেছি।"

হরকিষণ বলিলেন, "পাগল—সে কি ?"

জয়বন্ত বলিলেন, "হয় ত আমি যাহা বলিব, শুনিলে আপনি বিশ্বাস করিবেন না। এ এখন অজ্ঞান হইয়াছে—পরে——"

"এখানে অনেক লোক আছে, উহাকে দেখিবে—এইদিকে এস।"

উভয়ে বাহিরে আসিলে হরকিষণ দাস বলিলেন, "ব্যাপার কি—কি হইয়াছে—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

"পড়ো গোয়ালঘরের কূপের মধ্যে।"

"তুমি তুলসী বাঈকে পাগল বলিতেছ কেন ? কিন্তু আমি দেখি-তেছি, তুমি নিজেই——"

"শুনুন সব," বলিয়া জয়বন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত তাঁহাকে বলিলেন। তুলসী বাঈ কূপের উপর হইতে তাঁহাকে যাহা শাসাইয়া বলিয়াছিল, তাহাও বলিলেন। শুনিয়া হরকিষণ দাস বলিলেন, "তাহার মানে কি ? তবে কি গোপাল দাস মারা গিয়াছে ?"

"তুলসী বাঈ ত বলিল,—কেমন করিয়া বলিব ?"

"ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তুলসীর জ্ঞান হইলে সে নিশ্চয়ই সব বলিবে।"

"যদি না বলে ?"

"যাহাতে বলে তাহা করিতে হইবে।"

সহসা তাঁহারা এক বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন -তুলসী আবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ভূত—ভূত—ভূত।"

সেইদিন হইতে তুলসী ঘোরতর জ্বরে আক্রান্ত হইল। তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল, অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, জীবনের আশা খুব কম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রোষান্বিতা

হরকিষণ দাস তুলসী বাঈএর সুচিকিৎসার জন্য ব্যয় করিতে ত্রুটি করিলেন না। সুচিকিৎসায় তুলসী বাঈ সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

প্রায় পনের দিন পরে সে পথ্য পাইল, উঠিয়া বসিতে পারিল। ডাক্তার সাহস দিয়া বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই, আপনারা এখন ইহাকে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

পর দিবস বৈকালে হরকিষণ দাস ও জয়বন্ত উভয়ে তুলসীর ঘরে আসিলেন। তুলসী তাঁহাদের মুখের দিকে কেবল একবার ব্যাকুলভাবে চাহিল, কোন কথা কহিল না।

জয়বন্ত বলিলেন, "তুলসী বাঈ, যেমন করিয়া হউক, আমি রক্ষা পাইয়াছি, সে কথা শুনিবার তোমার আবশ্যক নাই। এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, তুমি আমাকে কূপের ভিতর ফেলিয়া দিয়া হত্যা করিতে গিয়াছিলে কেন?"

তুলসী বাঈ কোন উত্তর দিল না।

জয়বন্ত বলিলেন, "আমি তোমার উপরে রাগ করি নাই। নিশ্চয়ই কোন কারণে তুমি আমার উপরে রাগ করিয়াছ, সে কারণ কি?"

এবারও তুলসী বাঈ কথা কহিল না।

জয়বন্ত বলিলেন,"তুমি সেদিন বলিয়াছিলে, আমি তোমার স্বামীকে খুন করিয়াছি। আমি কখনও তাহাকে দেখি নাই, আমি তাহার

নাম পর্য্যন্ত জানিতাম না। আমি জীবনে খুন করা দূরে থাক, কখনও কাহাকে সামান্য একটা আঘাত পর্য্যন্ত করিতে সাহসী হই নাই।"

এবার তুলসী বাঈ তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। জয়বন্ত বলিলেন, "তোমাকে মুখ দেখাইতে আমি লজ্জিত নই। তোমার স্বামীকে যদি আমি খুন করিতাম, তাহা হইলে কি আমি তোমার সম্মুখে এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম?"

তথাপি তুলসী বাঈ নিরুত্তর।

জয়বন্ত বলিতে লাগিলেন, "আমি যে জাহাজে এখানে আসিয়াছিলাম, সে জাহাজে একটি লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল, কি খুন হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না; তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই। সে-ই কি তোমার স্বামী? না অন্য সেই লোক, যে ব্যক্তি খুন হইয়াছিল?"

এবার তুলসী বাঈ কথা কহিল, বলিয়া উঠিল, "অন্য লোক! সে আবার কে?"

জয়বন্ত কহিলেন, "হাঁ, জাহাজে দুইজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল।"

তুলসী বাঈ কহিল, "আমি কেবল একজনের মৃতদেহ দেখিয়াছিলাম।"

হরকিষণ দাস বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি কি রকমে দেখিলে?"

তুলসী বাঈ কথা কহিয়া ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আর কোন কথা কহিল না। কেবল একবার বিরক্তদৃষ্টির দ্বারা জয়বন্তকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল।

জয়বন্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার বলিলেন, "তুলসী বাঈ, তুমি ছেলে মানুষ হইয়ো না। আমি তোমার স্বামীকে খুন করি নাই,

ইহা তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ? যদি যথার্থই তিনি খুন হইয়া থাকেন, তবে তোমার জানা উচিত যে, কিরূপে খুন হইয়াছেন। জাহাজে দুইটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কোনটিই দেখি নাই। কাপ্তেন কাহাকেও দেখিতে দেয় নাই। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ তোমার স্বামী হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে খুন হইয়াছেন, তাহা তোমার জানিবার চেষ্টা করা উচিত। সেইজন্য বলিতেছি যে, তুমি সব আমাদিগকে বল।"

তুলসী বাঈ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিল, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

"অবিশ্বাসের কারণ নাই, বরং বিশ্বাস করিলে ফল আছে। আমি এক সময়ে ডিটেক্‌টিভগিরি শিখিয়াছিলাম। আমায় সব বলিলে আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারিব।"

তুলসী বাঈ আবার কহিল, "আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।"

জয়বন্ত কহিলেন, "আমি জানি, কিন্তু কেন অবিশ্বাস করিতেছ, বল। তাহা হইলে আমি তোমায় বুঝাইয়া দিতে পারি যে, অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।"

তুলসী বলিল, "আমি তোমাকে আমার স্বামীর কাপড় পরিতে দেখিয়াছি।"

"কি! তোমার স্বামীর কাপড়!" বলিয়া জয়বন্ত বিস্ময়ব্যাকুলনেত্রে তুলসীর মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "আমি—আমি তোমার স্বামীর কাপড় পরিতেছি, সে কি? সত্যই তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি।"

তুলসী বলিল, "হাঁ, তোমার কাপড়ে আমার নিজের হাতের চিহ্ন রহিয়াছে, আর ঐ কাপড় পরিয়াই আমার স্বামী বাহির হইয়াছিলেন।"

জয়বন্ত বলিলেন, "কি—কি—দেখি—হাঁ—মনে পড়িয়াছে—একটা বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্রে লাফাইয়া পড়ায় আমার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। জাহাজে উঠিলে একজন ভদ্রলোক আমাকে তাড়াতাড়ি একখানা কাপড় আনিয়া দেয়, হয় ত ভুলিয়া অন্যের কাপড় আনিয়া দিয়াছিল—তাহা হইলে দেখিতেছি, তোমার স্বামী নিশ্চয়ই সেই জাহাজে ছিলেন। আচ্ছা, তিনি খুন হইয়াছেন, কিসে জানিলে ?"

"তুলসী বাঈ বলিল, "আমি সে জাহাজে গিয়াছিলাম।"

"কেন ?"

"আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে।"

"তাহা হইলে তুমি জানিতে যে, তোমার স্বামী সেই জাহাজে আসিতেছেন ?"

"হাঁ, তাঁহার পত্র পাইয়াছিলাম।"

"সব খুলিয়া বল।"

"এখন বুঝিতেছি, অপর মৃতদেহই আমার স্বামীর।"

"সব খুলিয়া বল।"

"আমি সব বলিতেছি, বোধ হয়, সব বলাই ভাল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিস্ময়ান্বিত

হরকিষণ এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এইবার তিনি তুলসীকে বলিলেন, "তাহা হইলে গোপাল দাস বোম্বাই গিয়াছিল ?"

তুলসী বাঈ বলিল, "মনিবজী, সব বলিতেছি, আমার স্বামী আপনার টাকা চুরি করিয়াছিল।"

"আমার টাকা !"

"হাঁ, লাখ টাকা।"

"লাখ টাকা !"

হরকিষণ দাস মৃদুহাস্য করিলেন। লাখ টাকা তিনি এক সঙ্গে নিজেই কখনও দেখেন নাই ; মনে করিলেন, তুলসীর উন্মাদরোগ এখনও সারে নাই।

তুলসী বাঈ বলিল, "আপনি আমাকে পাগল মনে করিতেছেন, আমি পাগল নই। আপনার এক মামী বোম্বাই ছিলেন।"

হরকিষণ দাস চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন ; তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাহা তুমি জানিলে কিরূপে ?"

"স্বামীর কাছে শুনিয়াছিলাম। আপনার সেই মামী মারা গিয়াছেন, আপনার মামী লাখ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।"

হরকিষণ দাস বিস্মিত হইয়া বিস্ফারিতনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ! মুখ দিয়া কথা সরিল না।

তুলসী বাঈ বলিল, "আমার স্বামী আপনার সমস্ত চিঠী-পত্র খুলিত,

তাহাই সে আপনার মামীর উকীলের পত্রে তাঁহার মৃত্যুর কথা ও সম্পত্তির কথা জানিতে পারে। টাকার লোভে সে আপনার নাম লইয়া বোম্বাই গিয়াছিল।"

হরকিষণ দাস ভয়ানক ভ্রুকুটি করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝিতেছি।"

জয়বন্ত বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি।"

হরকিষণ দাস ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিতেছি আমার মাথা! আমার সে লাখ টাকা কই?"

তুলসী বাঈ বলিল, "নিশ্চয় কেহ আমার স্বামীকে খুন করিয়া এ টাকা চুরি করিয়াছে।"

জয়বন্ত বলিলেন,"তোমার স্বামী যে তোমাকে চিঠী লিখিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?"

"আছে, ঐ বাক্সে।"

জয়বন্ত বাক্স হইতে চিঠীখানি লইয়া পড়িলেন। তৎপরে বলিলেন, "আর তুমি কিছু জান না?"

"না।"

"ভাল, আমি এ বিষয় সন্ধান করিব, যদি কিছু জানিতে পারি, তোমায় বলিব।" তাহার পর তিনি হরকিষণ দাসের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসুন।"

তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী গোপাল দাস চোর—তাঁহার টাকা চুরি করিয়াছিল, ক্রোধে হরকিষণ দাসের আপাদমস্তক পূর্ণ হইয়া গেল। কোন কথা কহিলেন না। জয়বন্তের সহিত বাহিরে আসিলেন।

হরকিষণ বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। জয়বন্ত বলিলেন, "যাহা শুনিলেন, আপনার বিশ্বাস হয়?"

"বিশ্বাস হয় ? কেন হইবে না, চোর—বদমাইস—জালিয়াৎ——"

"আপনার হইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার আমাকে দিবেন ?"

"আমার হইয়া !"

"হাঁ, আপনার লাখ টাকা চুরি গিয়াছে।"

"তা ত স্পষ্ট দেখিতেছি।"

"এই টাকা কে চুরি করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আমি করিব।"

"তুমি করিবে ?"

"কেন নয় ? আমি দিনকতক গোয়েন্দাগিরি শিখিয়াছিলাম।"

"তুমি কি করিতে চাও ?"

"বোম্বাই গিয়া ইহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে, যে লোকটার মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে যথার্থ গোপাল দাস কিনা।"

"তাহার পর কি করিবে ?"

"তাহার পর অনুসন্ধান করিতে হইবে, কে আপনার মাতুলানীর উকীল ছিলেন, তিনি যথার্থ গোপাল দাসকে সে লাখ টাকা দিয়াছিলেন কি না।"

"তাহার পর ?"

"খুব সম্ভব, নোটই দেওয়া হইয়াছিল, লাখ টাকা এত ভারি যে কেহ নগদ লইতে পারে না। যদি নোট হয়, তাহা হইলে তাহার নম্বর পাওয়া যাইবে।"

"এ কথা মন্দ শুনাইতেছে না।"

"এই টাকার জন্য খুন, সুতরাং পুলিসও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

"সে সব কথাই ঠিক, তবে আমি যে সে টাকা আর পাইব, তাহার কোন আশা নাই।"

"সামান্য খরচ ——"

"আমার মুখে রক্ত ওঠা টাকা—এই বাইশ-হাত-জলে-পড়া টাকার আশায় আমি খরচ করিতে ইচ্ছা করি না।"

"সামান্যই খরচ হইবে।"

"কত ?"

"এই খুব বেশী হয় ত এক শত টাকা।"

"এক শত টাকা! ইহাও জলে যাইবে।"

"যাইবে না।"

"তুমি ত দেখিতেছি, আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিতেছ।"

"আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে এ টাকা পাওয়া যাইবে।"

"আচ্ছা, একশত টাকা খরচ করিতে রাজী আছি, তাহার উপর এক পয়সাও নয়।"

"ইহার বেশী এক পয়সাও খরচ করিতে হইবে না।"

(উদ্দেশ্যে) "চোর—বদমাইস——"

"তাহাকে এখন গালি দিয়া কোন ফল নাই; এখন আপনার মামীর বিষয় কি জানেন, তাহাই আমায় বলুন।"

"আমি কিছুই জানি না। শুনিয়াছিলাম, বোম্বাই সহরে আমার এক মামী আছেন, এইমাত্র।"

"যাহাই হউক, আমি সে সব সন্ধান করিয়া বাহির করিব—তিনি যখন মারা গিয়াছেন, তখন তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আদালতের হুকুম লইতে হইয়াছে; আদালতে সন্ধান করিলেই তাঁহার বিষয় জানিতে পারিব। আজ এখন টাকা দেন ত, আজই এ সন্ধানে বাহির হই।"

"তাহা যেন দিলাম, তুমি যে আমার জন্য এত খাটিবে, তুমি কি চাও ? আগে সব কথা হওয়া ভাল।"

"আমি এখন কিছু চাহি না। আগে আপনার টাকা আপনাকে দিই, তাহার পর সে সম্বন্ধে কথা হইবে। আর আমি ভৃত্যতুল্য—যাহা দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাহাই দিবেন।"

"আগে এ বিষয়ে কথা হওয়াই ভাল।"

"কাজ আগে হউক।"

"আমি সে কথা ভাল বুঝি না।"

"আমি টাকা চাহি না।"

"টাকা চাও না?"

"হাঁ, আমি টাকা চাহি না।"

"তবে তুমি কি চাও?"

"একান্তই শুনিতে চাহেন, যদি আমি আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি যে—টাকার আশাই নাই, তাহা যদি আমি আপনার হাতে আনিয়া তুলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে পুরস্কার স্বরূপে আপনার কন্যা হিঙ্গনকে আমি প্রার্থনা করি।"

দ্বিতীয় খণ্ড

পাপে—মৃত্যু

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধান আরম্ভ

সেইদিন জয়বন্ত পোর-বন্দরে আসিলেন। যে দুই মৃতদেহ জাহাজে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে পুলিস কতদূর কি জানিতে পারিয়াছে, প্রথমে তাহাই সন্ধান লইতে লাগিলেন। দেখিলেন, পোরবন্দরের পুলিস এ সম্বন্ধে কিছুই সন্ধান করিতে পারে নাই। লোক দুইটি যে কে, তাহারও সন্ধান হয় নাই। তাহারা দুই মৃতদেহের ফটোগ্রাফ তুলিয়া বোম্বাই পুলিসকে পাঠাইয়া দিয়াছে।

জয়বন্তের ইচ্ছা নহে যে, তিনি কোন কথা পুলিসকে বলেন। একবার একটু গোলযোগ হইলে সমস্তই গোলযোগের দিকে যাইবে—খুনী ও চোরকে আর ধরিতে পারা যাইবে না। তবে দ্বিতীয় মৃতদেহ যথার্থই গোপাল দাসের কি না জানিবার জন্য তিনি অনেক কষ্টে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার নিকটে নানা অজুহতে তাহার একখানি ফটো ছবি সংগ্রহ করিলেন। তিনি হরকিষণ দাসের নিকট হইতে একখানি ফটো ছবি লইয়াছিলেন। উভয় ছবি মিলাইবামাত্র বুঝিলেন যে, যথার্থই হতভাগ্য গোপাল দাস খুন হইয়াছে।

এখন তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, কোন লোক টাকার লোভেই গোপাল দাসকে খুন করিয়াছিল, তাহার পর তাহার মৃতদেহ সরাইবার জন্য বাক্স-বন্দী করিয়া আনিতেছিল। ঘটনাচক্রে খুনীও সেই জাহাজে খুন হইয়াছে। বোধ হয়, সেই টাকা তাহার নিকট আছে বলিয়া তাহাকে জাহাজে খুন করিয়া মার্ভি-বন্দরে নামিয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ সে টাকাও লইয়া গিয়াছে।

যেদিক দিয়াই হউক, বোম্বে না গেলে ইহার কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না। যে জাহাজে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তিনি চেষ্টা করিয়া সেই জাহাজেই রওনা হইলেন; কিন্তু জাহাজে অধিক কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রকৃতপক্ষে জাহাজের লোক বিশেষ কিছুই জানিতে পারে নাই।

তিনি বোম্বাই উপস্থিত হইয়া প্রথমে আদালতে অনুসন্ধান করিলেন। শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে, সেই বৃদ্ধা মামীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হইতেছেন, পোর-বন্দরের হরকিষণ দাস; এবং তাঁহার উকীল হইতেছেন—মেটা। অনুসন্ধানে আরও জানিলেন যে, হরকিষণ দাসের হইয়া মেটা আদালতের অনুমতি লইয়া সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

জয়বন্ত ভাবিলেন, "এখন এই উকীল মেটার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করা বা বলা ভাল—না, কি জানি, এই মেটাই যদি এই ব্যাপারে প্রথম হইতে জড়িত থাকে? কাহাকেও বিশ্বাস নাই। প্রথম হইতেই সাবধান হইয়া কাজ করা ভাল।"

তিনি বাহির হইতে মেটার আফিস দেখিলেন। তৎপরে তিনি তাহাকে এক পত্র লিখিলেন,——

"মহাশয়,

শুনিলাম, আপনি একজন কেরাণী খুঁজিতেছেন। আমি একটু

আইনকানুন শিখিতে ইচ্ছা করি, আপনি যদি আমাকে আপনার আফিসে রাখেন, তাহা হইলে আমি বিনা মাহিনায় আপনার কেরাণীর সমস্ত কার্য্য করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি, অধিকন্তু মাসে মাসে কিছু কিছু দিতেও স্বীকৃত আছি ; ইতি।

বশম্বদ

জয়বন্ত লালজীভাই।"

মেটার অবস্থার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার কেরাণী রাখিবার ক্ষমতা ছিল না ; অথচ একজন কেরাণী না থাকিলে তাহার মান থাকে না। এরূপ সুবিধা আর সে কোথায় পাইবে ? বিনা মাহিনায় কেরাণী—তাহার উপরে আবার মাসে মাসে কিছু দিতেও চাহে, সে তৎক্ষণাৎ জয়বন্ত লালজী ভাইকে দেখা করিবার জন্য এক-খানা পত্র লিখিল।

পত্র পাইবামাত্র জয়বন্ত মেটার আফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেটাও তাঁহাকে সেইদিনেই কার্য্যে নিযুক্ত করিল। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পরেই বলিল, "আপনি আজ হইতেই থাকিতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নাই।"

সেইদিন হইতে জয়বন্ত মেটা সাহেবের কেরাণী হইলেন। যাহাতে মেটা তাঁহার উপরে কোনরূপে সন্দেহ করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। কাজ-কর্ম্ম মেটার কিছুই ছিল না। সুতরাং লালজী ভাই সমস্ত দিন প্রায়ই বসিয়া থাকিতেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য হরকিষণ দাসের মামীর বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত কাগজ-পত্র দেখা ; সুবিধামত যখন মেটা আফিসে থাকিত না, তখনই জয়বন্ত সেই সকল কাগজ-পত্র দেখিতেন।

ক্রমে তিনি সমস্তই জানিতে পারিলেন। হরকিষণ দাসের মামীর

মৃত্যু, তাঁহার সম্পত্তির সমস্ত তালিকা, সেই সমস্ত যেরূপে যাহার নিকটে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা তিনি সমস্ত অবগত হইলেন। তবে টাকা মেটার নিকটে আছে কি না, তিনি তখনও তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে একদিন তিনি হরকিষণ দাসের এক রসিদ পাইলেন। সে রসিদ হরকিষণ দাসের হাতের লেখা নহে, জয়বন্ত বুঝিলেন, গোপাল-রাম দাস মেটাকে এই রসিদ দিয়াছিল। রসিদ লাখ টাকার। সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, গোপালরাম দাস মেটার নিকট লাখ টাকা পাইয়া তাহাকে রসিদ লইয়াছিল। আরও অনুসন্ধানে জয়বন্ত জানিলেন যে, মেটার নিকটে টাকা নাই। তাহার আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় দেখিলেন, তাহাতে তাহার হাতে লাখ টাকা পড়িলে তাহার কখনই এরূপ অবস্থা হয় না। সুতরাং এটা নিশ্চয় যে, মেটার নিকটে টাকা নাই ; তাহা হইলে এখন কথা হইতেছে—টাকা লইল কে ?

এ সম্বন্ধে মেটা কোনরূপে জড়িত আছে কি না, জয়বন্ত তাহা প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ; তবে মেটার ভাব-ভঙ্গিতে গুরুতর সন্দেহ হইল। মেটা যেন সর্ব্বদাই ভীত, সর্ব্বদাই সশঙ্ক, নিতান্ত গুরুতর, কোন ভয়াবহ কাজ না করিলে মানুষের এরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য হয় না। এ বিষয়ে বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন। মেটার আফিসে তাহার তিন-চারিখানি ছবি ছিল, একদিন তিনি মেটার অসাক্ষাতে একখানি ছবি সংগ্রহ করিলেন। তিনি জানিতেন যে, মেটা সহজে জানিতে পারিবে না যে, তাহার ছবি চুরি গিয়াছে।

ছবিখানি সংগ্রহ করিয়া জয়বন্ত জাহাজের টিকিট আফিসে উপস্থিত হইলেন। যে ভদ্রলোক টিকিট বিক্রয় করেন, তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। জয়বন্ত তাঁহাকে বলিলেন, "জাহাজে যে খুন হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আপনার কাছে আসিয়াছি।"

টিকিট বিক্রেতা তাঁহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "মহাশয় কি সংবাদপত্রের লোক? নূতন খবর আর কিছু নাই।"

"আমি সংবাদপত্রের লোক নই।"

"তবে পুলিস। তাহারাও ত হতাশ হইয়া এ অনুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়াছে।"

"এখানকার পুলিস দিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু পোর-বন্দরের পুলিসের চেষ্টা এখনও যায় নাই।"

"আপনি কি পোর-বন্দরের পুলিস-কর্ম্মচারী?"

"হাঁ, আমি পোর-বন্দরের পুলিসের লোক—কাল এখানে আসিয়াছি।"

"নূতন কিছু সন্ধান হইয়াছে?"

"কিছু যে না হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করিলে এ বিষয়ে বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইতে পারিব।"

"কি, বলুন।"

"যে দুইজন লোক সেবার এক কেবিনের টিকিট লইয়াছিলেন, তাহাদের চেহারা মনে হয়?"

"চেহারা সম্বন্ধে আমার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ—আমি তাঁহাদের দেখিলেই চিনিতে পারিব।"

"ইহাতেই আমাদের কাজ হইতে পারে।"

"বোধ হয়, কিছুই কাজ হইবে না। পুলিস এই দুইজন লোকেরই ছবি তুলিয়া এখানে পাঠাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের দুইজনের একজনকেও আমি চিনিতে পারি নাই। তাহারা যদি টিকিট লইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের চিনিতে পারিতাম।"

"আপনি কি নিশ্চিত বলিতে পারেন যে, তাহাদের চিনিতে পারিবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

জয়ন্ত পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, এখানা চিনিতে পারেন কি না।"

টিকিট বিক্রেতা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, এই একজন—এই একজন বটে?"

এই ছবি গোপাল দাসের।

জয়ন্তের ধমনীর ভিতর রক্ত খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এই লোককে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়।"

"কোন সন্দেহ নাই?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

জয়ন্ত আর একখানা ছবি বাহির করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে বোধ হইতেছে, এইখানি অপর লোকের ছবি।"

টিকিট বিক্রেতা বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই সে লোক। আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, বোম্বাই পুলিসের কাজ নয়। যদি এই দুইজন লোককে আপনি খুঁজিয়া পান, তাহা হইলে এ খুনের কিনারাও ঐখানেই হইয়া গেল।"

এই ছবিখানি উকীল বাইরামজী মেটার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৌশল

জয়বন্ত বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কি করিবেন, বহুক্ষণ সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনে মনে একটা স্থির করিয়া বাহির হইলেন।

তিনি বাজারে আসিয়া একজোড়া হাতকড়ী কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। তিনি পোর-বন্দর হইতেই একটা পিস্তল আনিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এখন পিস্তলটি বাহির করিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; এবং তাহাতে গুলি ঠিক করিয়া পকেটে রাখিলেন। কোন লোককেই বিশ্বাস নাই। তিনি জানিতেন, এখন ভয়ানক লোকের সহিত তাঁহার কাজ-কর্ম্ম।

তিনি মেটার আফিসে গিয়া মেটার বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন মেটা কি কাগজ-পত্র দেখিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে মেটা তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

জয়বন্ত তৎক্ষণাৎ দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে বসিলেন।

মেটা ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "একি! এখানে কেন?"

জয়বন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মেটা সাহেব, এ বেশি কিছু নয়, কেবল আপনার লীলা-খেলা ফুরাইয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে হাতকড়ী বাহির করিলেন। মেটা ইহাতে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "এ কি! এ কি!"

"বিশেষ কিছু নয়; তবে আমি মহাশয়ের কেরাণী নই, পোর-বন্দরের একজন ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টার।"

"পুলিস?"

"হাঁ, জাহাজের খুনের জন্য মহাশয়ের নামে একখানা ওয়ারেণ্ট আছে।"

মেটার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে কম্পিতকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারিল না।

জয়বন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মহাশয়কে ধরিবার জন্য একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছে, কিন্তু এখন আর কোন গোল নাই। মহাশয়ের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।"

মেটা এবারও কথা কহিতে পারিল না। জয়বন্ত বলিলেন, "তবে মহাশয়কে একটি কথা বলা প্রয়োজন, আমি মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিতে আসি নাই। আপনাকে যে গ্রেপ্তার করিবে, সে পোর-বন্দর হইতে রওনা হইয়াছে।"

"গ্রেপ্তার নয়, তবে কি?"

"আমি সেই লাখ টাকার সন্ধানে আসিয়াছি।"

মেটা তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিল।

জয়বন্ত বলিলেন, "আমি জানি, সে টাকা কোথায় আছে; কিন্তু তুমি তাহা আদৌ জান না। তবে মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হইতে পারে।"

মেটা ব্যগ্রভাবে বলিল, "সে কি?"

"সে এই—এপর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, তাহা যদি আমাকে সত্য করিয়া সমস্ত বল, তবে আমি তোমাকে পলাইতে সময় দিতে পারি। আর ইহাই এখন তোমার পক্ষে সদ্‌যুক্তি।"

"কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

"আমার কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। আমি তোমায় পলাইতে সময় দিব, ইহার পর যদি তুমি আবার আমার হাতে পড়, তাহা হইলে সে দোষ আমার নয়।"

"আমি সব বলিতেছি।"

"সৎ পরামর্শ—তোমার অনেক কথাই আমার নোটবুকে লেখা আছে।"

"আমি সত্যকথা বলিতেছি।"

"বল।"

"আমি তাহাকে লাখ টাকার নোট দিয়াছিলাম। নোটের নম্বর——"

(বাধা দিয়া) "আমি জানি।"

জয়বন্ত মেটার কাগজ-পত্রেও নোটের নম্বর পাইয়াছিলেন।

"তাহার পর তাহার সঙ্গে আমি জাহাজের টিকিট কিনিতে গিয়াছিলাম।"

"এ সবই আমি জানি।"

"তাহার পর টিকিট লইয়া হরকিষণ দাস চলিয়া গেলে আমি সেই কেবিনের অন্য টিকিটখানি কিনি।"

"হরকিষণ দাস কোথায় যায়?"

"তাহা আমি জানি না; তবে আগে আমাকে একবার দাঁতের বেদনার কথা বলিয়াছিল।"

এই বলিয়া মেটা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বলিল। তাহার কথা শেষ হইলে জয়বন্ত বলিলেন, "তাহা হইলে অবশ্যই তুমি নোট বন্ধ করিয়াছ।"

"হাঁ, করিয়াছি।"

"আমাকে একখানা চিঠী লিখিয়া দাও, ঐ চিঠীতে লিখ যে, নোট আর বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। নোট সম্বন্ধে গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে নোট তুমি পাইয়াছ ?"

"সে কথা এখন থাক—লেখ চিঠী।"

নিরুপায় মেটা পত্র লিখিয়া দিল। জয়বন্ত সেই পত্রখানা পকেটস্থ করিয়া বলিলেন, "ইহাতেই আমার কাজ হইবে। তোমাকে গ্রেপ্তার করা বা তোমায় ফাঁসীকাঠে তুলিয়া ধরা আমার কাজ নহে, সে কাজের ভার অন্যের উপরে পড়িয়াছে, তিনি আসিতেছেন, তাঁহার কাজ তিনি করিবেন, তাঁহার সাহায্য করিতে আমি বাধ্য নই।"

এই বলিয়া জয়বন্ত হাতকড়ী পকেটে রাখিলেন, উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখন যাও, আর বিলম্ব করিয়ো না, ইহার পর ধরা পড়, সে দোষ আমার নয়। অন্য কোন দেশে পলাইয়া গিয়া প্রাণটা রক্ষা করিতে পার।"

মেটা কোন কথা না কহিয়া সত্বর কতকগুলি কাগজ-পত্র সংগ্রহ করিয়া পকেটে রাখিল। তৎপরে জয়বন্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাহিরে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কেহ নাই ?"

"না, তাহা হইলে আমিই তোমাকে গ্রেপ্তার করিতাম।"

মেটা আর কোন কথা না কহিয়া সত্বরপদে নিজের আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল। জয়বন্ত তথায় প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

গোপাল দাস, মেটাকে দাঁতের বেদনার কথা বলিয়াছিল; সুতরাং খুব সম্ভব, সে কোন দন্ত-চিকিৎসকের নিকটে গিয়াছিল। বোম্বাই সহরে যে রাস্তায় চিকিৎসকগণ থাকেন, জয়বন্ত সেইদিকে চলি-

লেন। বলা বাহুল্য, মেটার আফিসে তাঁহার আবশ্যক যে কোন কাগজ-পত্র পাইলেন, তাহা সমস্তই সঙ্গে লইলেন।

রাস্তায় আসিয়া তিনি দুইখানা সাইনবোর্ড দেখিয়া তাঁহার মনে সহসা একটা কথা উঠিল। দেখিলেন, প্রায় পাশাপাশি দুইটি বাড়ীতে দুইখানা সাইনবোর্ড রহিয়াছে; একটিতে দন্ত-চিকিৎসক জামসেদজী সৈয়দজী পাটেল। আর একটীতে ডাক্তার পাটেল।

তিনি পুলিসের নিকট জানিয়াছিলেন যে, গোপালরামের দেহ যেরূপ ভাবে কাটা হইয়াছিল, তাহা কোন চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কাহারও কাজ নহে। এখানে এক ডাক্তার দোরাবজী সৈয়দজী পাটেল রহিয়াছে—পাশেই দন্ত-চিকিৎসক পাটেল। জয়বন্ত ভাবিলেন, "ইহারা সম্ভবতঃ দুই ভাই, হয় ত ইহারা ইহার কিছুই জানে না, তবে একবার ইহা-দের একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখা উচিত নয় কি? ইহাতে লাভ না হইলেও ক্ষতি কিছু হইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশার সঞ্চার

সেদিন জয়বন্ত আর বাসা হইতে বাহির হইলেন না। কি করিবেন, সমস্ত দিন বাসায় বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরদিন সেই ডাক্তার ও দন্ত-চিকিৎসকের সহিত দেখা করাই স্থির করিলেন।

প্রথমে তিনি ডাক্তার দোরাবজীর আফিসে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাহার আফিস বন্ধ। পার্শ্ববর্তী লোকের নিকটে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ডাক্তার অনেকদিন হইতে বিদেশে গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহারা জানে না। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার যদি আরও কিছু জানিবার থাকে, তাহা হইলে তাহার ভ্রাতা দন্ত-চিকিৎসক জামসেদজীর নিকটে জানিতে পারেন।

এই সংবাদ পাইয়া জয়বন্তের হৃদয় উৎসাহপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি ঠিক পথেই আসিতেছেন, আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। তিনি একজনকে বলিলেন, "বহুদিন আগে ডাক্তার পাটেল সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল, এই পাটেল আমার সেই পরিচিত বন্ধু কি না, তাহা বলিতে পারি না। ইঁহার চেহারা কিরূপ ?"

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ডাক্তারের চেহারা বর্ণন করিল। যে ব্যক্তি জাহাজে খুন হয়, তাহার ছবি জয়বন্তের নিকটেই ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার বন্ধু পাটেলের ছবি আমার সঙ্গেই আছে, দেখ দেখি, ইনি তিনি কি না ?"

সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, এই ত তাঁহারই চেহারা।"

"তাহা হইলে আমার ভুল হয় নাই ?"

"না, ঐ যে তাঁহার ভাই যাইতেছেন, উঁহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। উনি এই সময়ে রোজ বাড়ী যান।"

"না, উঁহার সঙ্গে আমার আলাপ নাই," বলিয়া জয়বন্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্যপথে প্রবেশ করিয়া তিনি ভাবিলেন, "ভালই হইয়াছে, দন্ত-চিকিৎসক মহাশয় এখন আফিসে নাই—ভালই হইয়াছে। কেহ-না-কেহ চাকর আছে—কিছু সন্ধান পাওয়া যাইবে, এ একটা চমৎকার সুযোগ বটে।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি দন্ত-চিকিৎসকের আফিসে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, একটি যুবক তথায় বসিয়া আছে। এই যুবকই সেই পাণ্ডুরাং।

জয়বন্ত তাহাকে বলিলেন, "একটা দাঁত দেখাইতে ইচ্ছা করি।"

পাণ্ডুরাং বলিল, "এইমাত্র ডাক্তার বাড়ী গেলেন, একটু আগে আসিলে দেখা হইত।"

"কি মুস্কিল ! আর একটু আগে আসিলেই হইত ! ছুটিয়া আসিয়াছি, একটু বসিয়া বিশ্রাম করিব।"

"বসুন না।"

"আমার একটি বন্ধু এই ডাক্তারের নিকটে আসিতে আমায় পরামর্শ দিয়াছেন, একটি গুজরাটী বন্ধু—তিনি ডাক্তারকে দিয়া একটা দাঁত তোলাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, দাঁত তুলিতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই।"

"অনেকেই এই রকম দাঁত তুলিয়া থাকেন।"

"ক্লোরাফর্ম্ম দিয়া ?"

"না, গ্যাস দিয়া।"

"ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে ?"

"না—না—সেই সময়ে একজন ডাক্তারও উপস্থিত থাকেন।"

"বটে, কোন্ ডাক্তার থাকেন ?"

"আমাদের ডাক্তারের ছোট ভাই—একটু আগেই তাঁহার আফিস।"

"বটে, তিনি এখন এখানে আছেন ?"

"না, তিনি বিদেশে গিয়াছেন।"

"কতদিন ?"

"ও! ঠিক মনে পড়িয়াছে, সেই গুজরাটী ভদ্রলোকটি যেদিন এসেছিলেন, তার পর দিন থেকেই তিনি বিদেশে গেছেন।"

"তোমার সেই গুজরাটী ভদ্রলোকটির কথা মনে পড়ে ?"

"বেশ মনে পড়ে, এখানে বড় বেশি খরিদ্দার আসে না।"

"তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে ?"

"কেন পারিব না ?"

জয়বন্ত গোপালদাসের ছবিখানি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন ; বলিলেন, "তাহার চেহারা কি এই রকম ?"

"এই রকম ? এই ত তাঁহারই ছবি।"

"বটে, আমার বন্ধু দাঁত তুলিবার সময়ে কি যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন ?"

"আমি তাহা জানি না।"

"কেন, তুমি কি তখন এখানে ছিলে না ?"

"না, আমি দুই ডাক্তারেরই কাজ করি। তখন ঐ ডাক্তারের আফিসে ছিলাম। আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়া সেইখানে কাজ করিতেছিলাম। যখন ফিরিলাম, তখন আপনার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।"

"ওঃ! তাহা হইলে কোথায় দাঁত তোলা হয় ?"

"এইখানেই," বলিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল।

জয়বন্ত বলিলেন, "কখন ডাক্তার আসিবেন?"

"যদি শরীর ভাল থাকে, বৈকালে আসিবেন।"

"কেন, তাঁহার কি কোন অসুখ হইয়াছে?"

"তাহাই বোধ হইতেছে।"

"কিছু বলেন নাই?"

"তাঁহার ভাই বিদেশে যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অসুখ হইয়াছে। আপনি যদি বৈকালে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে খবর দিতে পারি।"

"হাঁ, তাহাই আসিব।"

"ক-টার সময়?"

"এই বৈকালে—পাঁচটার সময়।"

"তাঁহাকে সংবাদ দিব, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।"

"আমিও নিশ্চয় আসিব," বলিয়া জয়বন্ত বিদায় লইলেন। তিনি জীবনে এরূপ আনন্দ কখনও উপভোগ করেন নাই। তিনি এখন সমস্ত ব্যাপারই বুঝিতে পারিয়াছেন। পাটেলদ্বয় টাকার লোভে গোপাল-দাসকে খুন করিয়াছে, তাহার পর একজন গোপাল দাস সাজিয়া তাহার দেহ সরাইবার জন্য জাহাজে গিয়াছিল, তথায় মেটা কর্ত্তৃক হত হয়। আর এক পাটেল এখানে আছে। যখন মেটার নিকটে টাকা নাই, যখন মেটার হস্তে যে হত হইয়াছিল, তাহার নিকটেও টাকা ছিল না, তখন এই মহাত্মা পাটেলের নিকটে যে টাকা আছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সেই লক্ষ টাকা হস্তগত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। আনন্দ টাকার জন্য নহে, আনন্দ—তিনি এইবার হিঙ্গনকে লাভ করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সঙ্কটাপন্ন

বৈকালে দন্ত-চিকিৎসক পাটেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জয়বন্ত বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলেন, এই সময়ে ডাকপিয়ন তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। তিনি সত্বর পত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া পাঠ করিলেন ;—

"গোবিন্দজীর চল্, বান্দোরা।

আমি আজই বোম্বাই হইতে যাইতেছি ; কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ সংবাদ পাইলাম। আপনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য এই সংবাদ আপনাকে না দিলে আমার নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা হয়। এখনই আসিবেন, না হইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।

বাইরামজী মেটা।"

জয়বন্ত পত্রখানি দুই-তিনবার পাঠ করিলেন। কি করিবেন, সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। যাইবেন, না যাইবেন না ? বৈকালে দন্ত-চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করিবার কথা।

তিনি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রথমে মেটার সঙ্গে দেখা করাই স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "এ লোকটার সঙ্গে আর দেখা করিবার সুবিধা হইবে না, এ নিশ্চয় এখান হইতে আজই পলাইবে, সুতরাং ইহার সঙ্গে দেখা করাই আবশ্যক, কি জানি, যদি কিছু নূতন সংবাদ পাই। পাটেল কিছুই জানে না, কোন সন্দেহ এখনও করে নাই, সুতরাং

তাহার সঙ্গে কাল দেখা করিলেও চলিতে পারিবে, সে কোথায়ও যাইবে না; কিন্তু মেটা এখানে থাকিতেছে না, ইহার সঙ্গেই প্রথমে দেখা করা উচিত।"

এইরূপ ভাবিয়া জয়বন্ত বান্দোরা রওনা হইলেন; কিন্তু মনে মনে তাঁহার সন্দেহ রহিল। এরূপ দুরাত্মা যে কৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তবে ভয় কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না. তাহার পকেটে পিস্তল ছিল. শরীরেও অসীম বল, তাঁহার কিসের ভয়?

তিনি বান্দোরার উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজীর চল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। বাড়ীটি দেখিয়া সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। দ্বারে মেটা দণ্ডায়মান ছিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "আসুন—আসুন—আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি, নতুবা এতক্ষণ এখান হইতে চলিয়া যাইতাম।"

"খবর কি?"

"আসুন—সব বলিতেছি, অনেক কথা আছে।"

মেটা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, জয়বন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বাড়ীতে আর কেহ যে আছে, তাহা বলিয়া বোধ হইল না। কয়েক পদ জয়বন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি সহসা তাঁহার পদনিম্ন হইতে গৃহ-তলের কিয়দংশ সরিয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, গৃহতল কাষ্ঠে নির্ম্মিত; কিন্তু তিনি ইহা জানিবার পূর্ব্বেই এক গহ্বরে পতিত হইলেন; কিন্তু সত্বর দুই হাতে একদিক্‌কার একখানা তক্তা ধরিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, নতুবা তিনি সেই গহ্বর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেন।

মেটা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, জয়বন্ত দুই হস্তে তক্তা ধরিয়া ঝুলিতেছেন; সে নিমেষমধ্যে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক লৌহদণ্ড বাহির

করিয়া তাঁহার দুই হস্তে প্রহার করিল। জয়বন্ত যাতনায় চীৎকার করিয়া হাত ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তিনি সেই গভীর গহ্বরের নিম্নে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেটা একটা লণ্ঠন সেই গহ্বরের মুখে ধরিয়া বলিল, "কি হে, আঘাত পাইয়াছ নাকি ?"

নিম্নে মাটি নরম থাকায় জয়বন্ত সৌভাগ্যক্রমে গুরুতর আঘাত পান নাই। তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "এই তোমার কৃতজ্ঞতা ?"

মেটা বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "হাঁ বন্ধু, আমাকে বাধ্য হইয়া তোমার প্রতি এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইতেছে ; তবে তোমাকে এমন অবস্থায় রাখিতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইতেছি—কি করিব, কাজ —কাজ—কাজ আগে।"

"আমি ইচ্ছা করিয়া তোমার ফাঁদে পা দিয়াছি।"

"অনুগ্রহ আপনার।"

"তোমার মৎলব কি ? কতদিন তুমি আমাকে এখানে এইরূপভাবে আটকাইয়া রাখিতে চাও ?"

"সে সবই তোমার বিবেচনার উপরে নির্ভর করিতেছে।"

"কি রকম ? তোমার কথা বুঝিলাম না।"

"অতি সহজ কথা—এই লাখ টাকার নোট আমার হাতে আসিলেই তুমি মুক্তি পাইবে।"

"আর যদি নোট আমি তোমায় না দিই ?"

মেটা কেবল হাসিয়া উঠিল।

জয়বন্ত বলিলেন, "যদি নোট আমার কাছে না থাকে ?"

মেটা আবার হাসিল ; হাসিয়া বলিল, "তুমিও নির্ব্বোধ নও—আমিও নই, কাজের লোক দুইজনেই—সুতরাং সেই রকম কাজের কথা হউক।

যতদিন আমি নোটগুলি না পাইব, ততদিন তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে। তবে একটু তাড়াতাড়ির আবশ্যক—আমার এখানে অধিক দিন থাকিবার উপায় নাই, তাহার কারণ তুমি ত জানই, বন্ধু।”

“তাড়াতাড়ি কি করিবে—যন্ত্রণা দিয়া আমার নিকট হইতে নোটের কথা জানিয়া লইবে?”

“সে তোমার অভিরুচি, ইচ্ছা করিলে তুমি কোন যন্ত্রণাই পাইবে না।”

“অর্থাৎ নোটগুলি তোমায় দিলে।”

“নিশ্চয়।”

“যদি নোটগুলি তোমায় না দিই, তুমি আমার কি করিবে?”

“দেখিতেছ, এখন আমার জিতের খেলা।”

“যদি আমার কাছে নোট না থাকে?”

“তা জানি, কাছে নাই—তাহা হইলে ফাঁদটা ভিন্ন রকমে পাতা হইত—তোমাকে অজ্ঞান করিয়া নোট লইতাম।”

“এখন তুমি আমাকে কি করিতে বল?”

“তুমি আমার কাছ থেকে চিঠী লিখিয়া লইয়াছিলে, এখন যাহার কাছে নোটগুলি আছে, তাহাকে সেইগুলি আমাকে দিবার জন্য একখানা পত্র লিখিয়া দাও।”

“পত্র দিব কাহাকে?”

“যাহার কাছে নোটগুলি আছে?”

“আর যদি না দিই——”

“তাহা হইলে এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর, যখন শিক্ষা আর জ্ঞান উভয়ই তোমার লাভ হইবে, তখন সহজেই সম্মত হইবে—এখানে আহার নাই—জল নাই——”

"তুমি আমাকে খুন করিবে?"

মেটা কেবল উচ্চ হাস্য করিল। তৎপরে বলিল, "সে ইচ্ছা আমার নাই—তোমার ইচ্ছার উপরেই তাহা নির্ভর করে; এখন থাক, যে ঘরে তুমি আছ, সেখানে দম বন্ধ হইয়া মরিবে না, উপরে জানালা আছে—তাহার ভিতর দিয়া হাওয়া যাইবে, কিছু আলো পাইবে, এই আলো ও হাওয়া খাইয়া আপাততঃ কিছুদিন পরমানন্দে কাটাও—পলাইবার আশা করিয়ো না, পলাইবার উপায় নাই। এখানে হাজার চীৎকার করিলেও কেহ তোমার কথা শুনিতে পাইবে না। সদ্‌বুদ্ধি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ এই ঘরে বন্ধ থাক।"

এই বলিয়া উপরের দরজা বন্ধ করিয়া মেটা চলিয়া গেল। জয়বন্ত ঘোর অন্ধকারে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর-গৃহে আবদ্ধ রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুক্তির উপায়

জয়বস্তের নিকটে এখন রাত্রিদিন সমান হইয়াছে, তিনি যে গৃহে আছেন, তথায় কোনরূপেই কোনদিক হইতে আলো আসিবার উপায় ছিল না। তিনি গহ্বরের প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই দুর্বৃত্তের হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখান হইতে বাহির হইয়া যাইবার কোন উপায় নাই।

গৃহের উপরে দুইটা ছোট জানালা আছে বটে, কিন্তু তাহা এত উচ্চে যে, সেখানে উঠিবার কোন উপায় নাই; যদিই বা কোনরূপে জানালায় উপস্থিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলেও জানালা দুটি এত ছোট যে, তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রাচীরে ঠেস দিয়া জয়বন্ত নানা চিন্তা করিতেছিলেন, বিপদে পড়িয়া ভীত বা হতাশ হইবার লোক তিনি ছিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "যদি অদৃষ্টে এখন মৃত্যু না থাকে, একটা-না-একটা কোন উপায় হইবেই।"

এই সময়ে গৃহমধ্যে কি নড়িয়া উঠিল। গৃহমধ্যে কি প্রবেশ করিল, তাহা তিনি প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না; অবশেষে দেখিলেন, গৃহের এক পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র নর্দ্দামা আছে, সেই নর্দ্দামা দিয়া একটা বিড়াল সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তাহার দুইটি শাবকও আসিয়াছে।

জয়বন্ত বুঝিলেন, এখানটা নির্জ্জন পাইয়া বিড়াল এখানে প্রসব করিয়াছিল। আবার এই নির্জ্জনগৃহে শাবকসহ রাত্রে আসিয়াছে।

বিড়াল দেখিয়া জয়বন্তের মনে সহসা একটা মৎলব উদয় হইল। তিনি নড়িলেন না—নড়িলে পাছে বিড়ালটা পলাইয়া যায়; মৃদুস্বরে চুম্‌কুড়ি দিয়া ডাকিলেন, "পুস্—পুস্—পুস্——"

বিড়ালটা লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিকটস্থ হইল। তিনি আদরে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিড়াল তাঁহার গায়ে পা দিয়া খেলা করিতে লাগিল, লাঙ্গুল দিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

বামহস্তে বিড়ালকে ধরিয়া রাখিয়া জয়বন্ত দক্ষিণ হস্তে পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিলেন;—

"এই পড়ো বাড়ীতে একজন দস্যু আমাকে গৃহতলস্থ একটি গুপ্ত গহ্বরের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছে, আমাকে খুন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। যাঁহার নজরে এই পত্র পড়িবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দেন।"

তিনি নিজের পরিচিত কাপড়ের এক অংশ ছিঁড়িয়া চিঠীখানি বাঁধিয়া সেই চিঠী বিড়ালের গলায় বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর বিড়ালকে তাড়া দেওয়ায় সে শাবকসহ সত্বর সেই গৃহ হইতে নর্দ্দমা দিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। জয়বন্ত ভগবানের উপরে আত্মরক্ষার ভার দিয়া আবার প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিলেন; এখন তাঁহার তন্দ্রা আসিল, তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। সহসা কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন। দেখিলেন, উপর হইতে আলো গৃহমধ্যে পড়িয়াছে; বুঝিলেন, আবার মহাপাপী মেটা আসিয়াছে।

মেটা উপর হইতে বলিল, "কেমন, বেশ আরামে ঘুম হইতেছে ?"

তাহার কথায় জয়বন্ত ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। বলিলেন, আমি নিতান্ত আহাম্মুখ, তাহাই তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

"মহাশয় তাহা জানেন, আমি কিরূপে জানিব ?"

ক্রোধে জয়বন্ত কথা কহিতে পারিলেন না।

মেটা বলিল, "তোমায় কিরূপে এই ঘর হইতে বাহির করিব, ইহাই এখন আমার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়াছে।"

জয়বন্ত সোৎসাহে বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমাকে এখান হইতে বাহির করিতে চাও—সহসা এরূপ মত-পরিবর্ত্তন ?"

"হাঁ, এই রকম ইচ্ছা।"

"তবে একটা দড়ী ফেলিয়া দাও—তাহাই ধরিয়া আমি উঠিব।"

"যখন তোমায় বাহির করিব মনে করিতেছি, তখন তুমি দড়ী ধরিতে পারিবে না।"

"কেন ?"

"তখন তুমি এই ঘরে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিবে।"

"কেন ?"

"কেন আবার কি, মরিলে অসাড় হয়, জান না ?"

"পিশাচ—নারকি ! খুনি !"

"অস্বীকার কেমন করিয়া করি, মহাশয়ের কাছেই একবার স্বীকার করিয়াছি।"

"তাহা হইলে তুমি আমাকেও খুন করিতে চাও ?"

"বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, খুন হওয়া-না-হওয়া মহাশয়ের হাত।"

"কিসে ?"

"যাহার কাছে নোটগুলি আছে, তাহাকে একখানা পত্র দিলেই সব গোল চুকিয়া যায়।"

সহসা এই সময়ে বাড়ীর সদর দরজায় সবলে কে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল, সেই শব্দে মেটা চমকিত হইয়া সেইদিকে ফিরিল।

দ্বারে আরও সবলে আঘাত চলিতে লাগিল। কাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "শীঘ্র দরজা খোল, না হয় দরজা ভাঙিয়া ফেলিব।"

মেটা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল। সে জানিত, এখানে যে জনমানব আছে, তাহা কেহ জানে না, তবে এ কাহারা?

মেটা পর মুহূর্ত্তেই বাড়ীর সদর দরজার দিকে না গিয়া বাড়ীর পশ্চাতের দিকে ছুটিল, সেদিকে একটা ক্ষুদ্র দরজা ছিল, সে সেই দরজা দিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে যাহারা দ্বারে আঘাত করিতেছিল, তাহারা দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহারা পুলিস। যাঁহার বিড়ালের গলায় জয়বন্ত পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, বিড়াল তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া যাইবামাত্র তিনি তাহার গলায় কি বাঁধা আছে দেখিয়া পত্র খুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন। প্রথমে তিনি বিশ্বাস করেন নাই, তবে সত্য হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি পুলিসে সংবাদ দিলেন।

পুলিসও প্রথমে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই, তবে সত্য হইলেও হইতে পারে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি, এই ভাবিয়া তাহারা সেই বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দেখিল, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। তখন একটা কিছু হইয়াছে, নিশ্চিত জানিয়া তাহারা দরজা ভাঙিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

গৃহমধ্যে অপর লোক প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া জয়বন্ত

প্রাণপণে চীৎকার করিয়া তাহাদের ডাকিতে লাগিলেন। তখন পুলিস-কর্ম্মচারিগণ গহ্বরের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দড়ী ফেলিয়া দিয়া তাহারা অনেক কষ্টে জয়বন্তকে উপরে তুলিল।

জয়বন্ত কিন্তু মেটার কথা তাহাদের কিছু বলিলেন না। বলিলেন, একজন বদমাইস লোক তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি তাহাকে চিনেন না। তাহার কি উদ্দেশ্য তাহাও বলিতে পারেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আত্মহত্যার চেষ্টা

জামসেদজী প্রত্যহ ভাবিয়া ভাবিয়া ক্রমশঃ উন্মত্তের মত হইয়া উঠিল। প্রত্যহ সে ডাকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিত, কিন্তু প্রত্যহই হতাশ হইত, এ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোন পত্রই আসিল না।

তবে তাহার কি হইল? জাহাজ হইতে সুবিধামত দেহটা সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া সে পোর-বন্দরে পৌঁছিবে, পৌঁছিয়াই তাহাকে পত্র লিখিবে। সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে তথায় দিনকতক থাকিয়া বোম্বাই ফিরিবে, কিন্তু এতদিন হইয়া গেল, সে ফিরিয়া আশা দূরে থাক, তাহার পত্র পর্য্যন্ত আসিল না—খুবই মুস্কিলের কথা।

অবশ্যই তাহার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে, নতুবা সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত. তবে কি ধরা পড়িয়াছে? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পুলিস তাহাকে নিশ্চয়ই বোম্বাই লইয়া আসিত।

তবে জামসেদজী এ পর্য্যন্ত একখানা নোটও ভাঙাইতে পারিল না।

ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ে তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া আসিল। আহার গেল, নিদ্রা গেল, তাহাকে দেখিলে এখন আর চেনা যায় না। তাহার পরিচিত লোকগণ তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল; সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, পাটেল সাহেবের নিশ্চয়ই কোন কঠিন রোগ হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।

জামসেদজী একদিন বৈকালে আর আফিসে যাইবে না ভাবিতে-ছিল,এইরূপ সময়ে তাহার কর্ম্মচারীর এক পোষ্টকার্ড পাইল; সে লিখি-য়াছে যে, একজন ভদ্রলোক বৈকালে দন্ত তুলাইতে আসিবেন, অবশ্য অবশ্য আফিসে আসিবেন।

এ কয়দিন এক পয়সাও উপার্জ্জন হয় নাই—খরচও চলিতেছে না, কর্জ্জ করিয়া কোনগতিকে চলিতেছে; সুতরাং একটা খরিদ্দার যখন আসিয়াছে, তখন শরীর ও মনের অবস্থা মন্দ হইলেও সে খরিদ্দারকে ছাড়া যাইতে পারে না—পাটেল সাহেব বেশ-বিন্যাস করিয়া আফিসে চলিল।

আফিসে আসিয়া সে বলিল, "কে আসিবে বলিয়া গিয়াছে, কখন আসিবে?"

তাহার লোক বলিল, "নিশ্চয়ই আসিবে।"

"কই এখন ত আসিল না। আমারই আসিতে দেরী হইয়াছে।"

"তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে আপনার কাছে আসিতে বলিয়া-ছিলেন—তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।"

"কে সে বন্ধু?"

"তাহার নাম জানি না। সেই যে গুজরাটী ভদ্রলোক—সেই যাঁহার দাঁত তোলার পরদিনে ডাক্তার সাহেব বিদেশে গিয়াছেন।"

অতিকষ্টে পাটেল সাহেব আত্মসংযম করিল। তাহার মনে যেরূপ

ভাব হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হইল, মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে বিকৃতস্বরে বলিল, "তিনি কি বলিলেন ?"

"বলিলেন যে, তাঁহার সেই গুজরাটী বন্ধু আপনার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।"

গুজরাটী বন্ধু—হত, খণ্ড-বিখণ্ড গুজরাটী বন্ধু তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছে ! তাহার সর্ব্বাঙ্গে গলদঘর্ম্ম ছুটিল, তাহার হাত পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে অতিকষ্টে সংযতস্বরে বলিল, "এই ভদ্র-লোক তাঁহারই বন্ধু ?"

"হাঁ, তাঁহার বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর তাঁহার একখানা ছবি আমাকে দেখাইলেন।"

এবার জামসেদজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার আফিসঘরশুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চোখের উপরে সবেগে ঘুরিতে লাগিল। জামসেদজী পড়িয়া যাইবার মত হইল—দুই হাতে সম্মুখস্থ টেবিলটা সজোরে চাপিয়া ধরিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, তাহার চক্ষু ভীতিবিস্ফারিত, মুখে ভীষণ বিভীষিকা ! পলাইবার চেষ্টা করা এখন বৃথা। খুব সম্ভব, এখনও সেই বাড়ীতে পাহারা রহিয়াছে। আর পলাইয়া ফল কি ? মরুক তাহারা—আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না ! ইহাপেক্ষা ফাঁসী গিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করা ভাল। ফাঁসী ? ফাঁসী ? চিরকালের জন্য লোকে বলিবে যে, জামসেদজী ফাঁসী গিয়াছে ? না—না—না—কেন, তাহা-পেক্ষা আত্মহত্যা করি না কেন ? সে যে ফাঁসী হইতে সহস্র গুণে ভাল।

সে তাহার কর্ম্মচারীকে বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, "সেই ভদ্রলোক আসিলে আমাকে সংবাদ দিয়ো, তুমি এখন বাহিরে গিয়া বস।"

পাণ্ডুরাং বাহিরে গেলে সে নিজের ঘরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল।

গৃহের এক কোণে একটি ছোট লোহার সিন্দুক ছিল, সে তাহা খুলিল, একতাড়া কি বাহির করিয়া লইয়া টেবিলের সম্মুখে রাখিল, এ সেই লাখ টাকার নোট!

এ নোট দেখিয়া এখন তাহার হৃদয় আর আনন্দে স্পন্দিত হয় না। এখন এই নোট দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। খুন—চুরি—কি ভয়ানক! পাপ করিলে মানুষের এতই অশান্তি জন্মে!

সকল কথা পুলিসকে লিখিবে বলিয়া সে কাগজ কলম লইল; কিন্তু হাত এতই কাঁপিতে লাগিল যে, একটা পংক্তিও লিখিতে পারিল না; কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর নোটগুলি একটি খামে পূরিয়া উপরে ঠিকানা লিখিল, "পুলিস কমিশনার—বোম্বাই।"

মৃত্যু—মৃত্যুতে এত ভয় কেন? এ অসহনীয় যন্ত্রণাপেক্ষা মৃত্যু কি শতগুণে শ্রেয়ঃ নহে? বাঁচিয়া থাকিয়া ফল কি? যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, ততদিন এই বিভীষিকা! মৃত্যু শ্রেয়ঃ! এখন পুলিস সকল সন্ধানই পাইয়াছে—তাহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল, আবার এখনই আসিবে, এখনও হয় ত পাহারায় রহিয়াছে, তাহার পলাইবার কোন উপায় নাই, এখন পুলিসে তাহাকে ধরিবে, তাহার পর—তাহার পর ফাঁসী? না—না—তাহাপেক্ষা আত্মহত্যাই ভাল। জামসেদজী পাণ্ডুরাংকে আবার ডাকিল; মনে করিল, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল। পাণ্ডুরাং আসিলে জামসেদজী তাহাকে বলিল, "আমার জন্য এ কয়টা জিনিষ মোডি কোম্পানীর দোকান হইতে লইয়া এস। এই পত্র দিতেছি।"

পাণ্ডুরাং পত্র লইয়া বিদায় হইল। জামসেদজী আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পরে টেবিলের ভিতর হইতে একখানা শাণিত ছুরিকা

বাহির করিল ; কিন্তু তাহার হাত এতই কাঁপিতে লাগিল যে, ছুরিখানা প্রায় হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হইল। সে টেবিলের উপরে হাত রাখিল।

আত্মহত্যা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নহে। মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, শতবার, সহস্রবার বাঞ্ছনীয়, তবুও মৃত্যুতে এত ভয় কেন ? কে বলিবে কেন ? জামসেদজী পুনঃ পুনঃ সেই ছুরি তুলিয়া কণ্ঠে বসাইবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না ; তখন বলিল, "হা ভগবন্, আমায় বল দাও—বল দাও—এ যন্ত্রণা আমার আর এক নিমেষের জন্য সহ্য হয় না।"

এই সময়ে সবলে কে বাহির হইতে তাহার দ্বারে আঘাত করিল। জামসেদজী চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সত্বর টেবিলের ভিতরে ছুরি-খানা লুকাইয়া ফেলিল, এরূপে আত্মহত্যায় ব্যাঘাত পড়ায় জামসেদজী সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইল না।

আবার দ্বারে কে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিল! পুলিস—পুলিস, তাহার পা এতই কাঁপিতে লাগিল যে, আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। আবার ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আবার দ্বারে আঘাত—আবার আঘাত! সে আঘাত ততোধিক বেগে তাহার হৃদয়ে লাগিতেছিল। জামসেদজী অতি কষ্টে হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিয়া উঠিল, দরজা খুলিয়া দিল ; দেখিল, দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইজন কনেষ্টবল !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আত্মহত্যা

পুলিস দেখিয়া জামসেদজী পড়িয়া যাইবার মত হইল, দরজার চৌকাঠ ধরিয়া তাহা সামলাইয়া লইল, নতুবা হয় ত পড়িয়া যাইত, শেষে অদৃষ্টে এই ছিল ? কনেষ্টবল তাহাকে সেলাম করিল। সেলাম ! গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া কেহ কথনও সেলাম করে না, একি—একি স্বপ্ন নাকি ! তবে—তবে—ইহারা কি জন্ত আসিয়াছে ? জামসেদজী দুই হাতে দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "আমরা বৎসর বৎসর আপনার নিকট কিছু বক্‌শিস পাইয়া থাকি।"

এই কথায় কি আনন্দের ভাব জামসেদজীর মনে উদিত হইল, তাহা বলা যায় না। জামসেদজী ব্যগ্রভাবে বলিল, "কাল বৈকালে আসিয়ো, অবশ্যই কিছু দিব।"

"যো হুকুম হুজুর," বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

কনেষ্টবলদিগের আগমনে তাহার একটা কাজ হইল। তাহার হৃদয়ে সাহস আসিল, ভাবিল, "আমি নিজের কল্পনায় একটা বিভীষিকা গড়িয়া এত ভীত হইয়া উঠিতেছি কেন ? হয় ত আদৌ সে পুলিসের লোক নহে—হয় ত পুলিস ইহার কিছুই জানে না, জানিতে পারে না। এই গুজরাটী সেই লোকের অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাতে আসে-যায় কি ? আমার ভয়ের কারণ কি ?"

এই সময়ে আবার কে দরজায় ঘা দিল। এবার পাটেল সাহেব সাহসে ভর করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "কে?"

"সেই কালকের ভদ্রলোকটি এসেছেন।"

"ডাক, এখানে।"

জয়বন্ত ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন। জামসেদজী হৃদয়ে বল বাঁধিয়া বসিয়াছিল। কিছুতেই বিচলিত হইবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। জয়বন্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, দন্ত-চিকিৎসক বলিল, "আসুন—বসুন।"

জয়বন্ত বসিলেন।

জামসেদজী বলিল, "শুনিলাম, একটি ভদ্রলোক, যাঁহার দাঁত আমি তুলিয়াছিলাম, তিনি আপনাকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

"হাঁ, তবে আপনি কেবল তাহার দাঁত তুলেন নাই।"

কথাটা এবং বলিবার ধরণটা জামসেদজীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল; সংক্ষেপে কহিল, "কেন?"

"আপনার চিকিৎসায় তিনি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিলেন।"

এই কথায় জামসেদজীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—মৃত ব্যক্তির মুখও এত পাংশুবর্ণ হয় না। তাহার পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জয়বন্তের যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাহা দূর হইল। তিনি একেবারে কাজের কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার, দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলে বোধ হয়, তোমার কোন আপত্তি নাই।"

ডাক্তারের মুখে কথা সরিল না। জয়বন্ত নিজে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে বসিয়া বলিলেন, "বুঝিতেই পারিতেছ যে, লীলাখেলা ফুরাইয়াছে—মহাশয় ও মহাশয়ের ভাই উভয়ে মিলিয়া হত-

কিষণ দাসকে লইয়া যে খেলাটুকু খেলিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে প্রকাশ পাইয়াছে।”

জামসেদজী একেবারে নীরব! সে বিস্ফারিতনয়নে যেন জয়বন্তের কথাগুলিই কেবল গিলিতেছে, তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, কথা কহিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

জয়বন্ত বলিলেন, “আমি পোর-বন্দরের পুলিসে চাকরী করি।

এবারও জামসেদজী নিরুত্তর।

সহসা অতি দৃঢ় ও গম্ভীরস্বরে জয়বন্ত বলিলেন, “সে লাখ টাকার নোটগুলি কই?”

জামসেদজী নীরবে কম্পিতহস্তে টেবিলের ভিতর হইতে নোটের খামটি জয়বন্তের হাতে দিল।

অতি কষ্টে জয়বন্ত হৃদয়ের আনন্দ গোপন করিলেন; বলিলেন, “দেখিতেছি, মহাশয় নোটগুলি পুলিস-কমিশনারের কাছে পাঠাইতেছিলেন।”

জয়বন্ত খামের ভিতর হইতে নোটগুলি বাহির করিলেন, পকেট হইতে নোট বই বাহির করিয়া নোটের নম্বরগুলি মিলাইয়া দেখিলেন, সব ঠিক আছে? নোটগুলি পকেটে পূরিয়া বলিলেন, “এগুলির ভার আপাততঃ আমিই লইলাম।”

এখন যত শীঘ্র হয়, জয়বন্ত এখান হইতে সরিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিলেন। বলিলেন, “অনেক পরিশ্রম লাঘব হইল? ইহার জন্য আমি তোমার কিছু উপকার করিতে ইচ্ছা করি। কি চাও—বন্ধু-বান্ধবকে চিঠী লেখা।”

জয়বন্তের কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তিনি এখানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করেন। যত শীঘ্র হয়, এখান হইতে যাইতে

পারিলেই ভাল, অথচ তাড়াতাড়ি করিলে পাছে জামসেদজী সন্দেহ করে তাহাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতেও পারিতেছেন না। বলিলেন, "কেমন—কি উপকার আমি তোমার করিতে পারি ?"

এবার জামসেদজীর মুখ হইতে কথা বাহির হইল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল,"আধঘণ্টা সময় দিন, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে দুই-একখানা চিঠী লিখিয়া লই।"

জয়বন্ত গম্ভীরভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাল—তাহা লিখিতে পার। দেখিতেছি, ইহার পিছনদিক দিয়া পলাইবার উপায় নাই। দেখ, যেন কোন বদ্‌মাইসী না হয়—আমি বাহিরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করিব। ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিব।"

এই বলিয়া জয়বন্ত ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জামসেদজী বক্ষে বাহুবিন্যাস করিয়া কক্ষমধ্যে দুই-একবার পরিক্রমণ করিলেন। এদিকে জয়বন্ত ক্রমে দূরে যাইতে লাগিলেন; অবশেষে সহসা একটা গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া একখানা গাড়ী পাইয়া তাহাতে উঠিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আর পাটেল সাহেব—জয়বন্ত চলিয়া গেলে সে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। যেন তাহার দেহ পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সহসা দূরে একটা ঘড়ি বাজায় সে চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, যেন তাহার সংজ্ঞা নাই; তাহার কর্ণে পৈশাচিক অট্টরোলে সঘনে নিনাদিত হইতেছে,"নরহত্যাকারী, ফাঁসী—ফাঁসী—ফাঁসী——

এবার জামসেদজী সাহস করিয়া টেবিলের ভিতর হইতে সেই প্রকাণ্ড ছুরিখানা বাহির করিয়া লইল। সুদৃঢ় হস্তে ছুরিখানা ধরিল, তার পরে নিমেষমধ্যে সেটা গলার একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত টানিল। তৎক্ষণাৎ মহাশব্দে জামসেদজী ভূপতিত হইল।

সেই শব্দে চমকিত হইয়া পাণ্ডুরাং ছুটিয়া তথায় আসিল। আসিয়া দেখিল, রক্তাক্তকলেবরে তাহার মনিবজী সাহেব পড়িয়া আছে।

* * * * *

পর দিবস বোম্বাইএর সকল সংবাদপত্রেই জামসেদজীর আত্মহত্যার কাহিনী বাহির হইল; কিন্তু কি জন্য যে জামসেদজী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার কোন সংবাদই কেহ পাইল না।

এ রহস্য কেবল দুই ব্যক্তি জানিতেন, এক উকীল বাইরামজী মেটা, সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে; আর এক জয়বস্ত—তিনি কখনই এ কথা প্রকাশ করিবেন না।

এ রহস্য গোপন রাখাই জয়বস্তের উদ্দেশ্য। মেটাকে দণ্ড দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি হরকিষণ দাসের লাখ টাকা উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, সে টাকা তিনি হাতে পাইয়াছেন; মেটা যে নোটের নম্বর বন্ধ করিয়াছিল,তাহাকে দিয়াই তাহা বাতিল করিয়াও লইয়াছেন এ অবস্থায় আর তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বোম্বাই থাকিবার ইচ্ছা ছিল না এই সকল কারণে আত্মহত্যার গূঢ়রহস্য বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রবক্ষে

বাসায় আসিয়া আত্মহত্যার কথা শুনিয়া জয়বন্ত ভাবিলেন, গোপাল দাসের খুনের দণ্ড হইয়াছে। দুই পাটেল মিলিয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল, দুইজনেই সেজন্য দণ্ড পাইয়াছে। একজনকে মেটা জাহাজে খুন করিয়াছিল, আর একজন আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, সুতরাং গোপাল দাসের সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে। তাহার পর টাকা প্রকৃত হরকিষণ দাসের, সে টাকা এখন নিজের হস্তগত হইয়াছে, এখন যাঁহার টাকা তাঁহার হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই হিঙ্গনকেও পাওয়া যায়।

বোধ হয়, জয়বন্ত জীবনে এত আনন্দ আর কখনও উপলব্ধি করেন নাই। ভাবিলেন, "এখনও বিশ্বাস নাই, যতক্ষণ না নোটগুলি হরকিষণ দাসের হাতে দিতে পারিতেছি, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই—ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাঁহার একটা কোট বাহির করিলেন। কোটের অস্তরের একদিক কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন, তাহার পর নোটগুলি কোটের দুই কাপড়ের ভিতরে রাখিয়া অস্তরের কাপড় সেলাই করিয়া দিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এই কোট এক নিমেষের জন্যও খুলিব না। ইহার উপরে আর একটা কোট পরিব। যতক্ষণ এই নোটগুলি হরকিষণ দাসের হাতে দিতে না পারি, ততক্ষণ এ কোট

কিছুতে গা হইতে খুলিব না। নোটগুলি ঠিক আমার বুকের নিকটে থাকিবে।”

পর দিবস তিনি দেখিলেন যে, একখানি জাহাজ পোর-বন্দরে যাইবে; তিনি তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনিলেন। সকালেই জাহাজে গিয়া উঠিলেন।

যাহার বুকের কাছে লাখ টাকা থাকে, সে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তাঁহার হৃদয়ে শান্তি হওয়া অসম্ভব—জয়বন্তেরও আহার নিদ্রা গিয়াছে। যতক্ষণ পোর-বন্দরে পৌঁছিয়া হরকিষণ দাসের হস্তে নোটগুলি গণিয়া দিতে না পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন কিরূপে?

জাহাজের কেবিনগুলির দরজা বন্ধ করিবার উপায় আছে কি না, ভাল করিয়া দেখিলেন। ভিতর হইতে বন্ধ করিবার উপায় আছে, ভিতর হইতে বন্ধ করিলে কাহারই আর ভিতরে যাইবার উপায় নাই, যাহাতে কেবল একজনেরই থাকিবার স্থান আছে, তিনি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এমন একটি কেবিন লইলেন। তিনি কাহারও সহিত একত্রে এক কেবিনে নিদ্রিত হওয়া নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। কি জানি, যদি নিদ্রিত অবস্থায় কেহ তাঁহার কোট হইতে নোটগুলি কাটিয়া বাহির করিয়া লয়।

জাহাজ যতক্ষণ না ছাড়িল, ততক্ষণ সর্ব্বদা বুকে হাত চাপিয়া জয়-বন্ত জাহাজের উপরে রহিলেন। জাহাজ ছাড়িলে তবে তিনি কতকটা নিশ্চিত হইলেন।

তাঁহার একমাত্র ভয় মহাপাষণ্ড বাইরামজী মেটাকে। সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে তাঁহাকে যেরূপ বিপদে ফেলিয়াছিল, বিড়ালের সাহায্য না পাইলে তাঁহার উদ্ধার হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে

নিশ্চয়ই তাঁহাকে খুন করিত। এখনও যে, সে টাকার লোভ ছাড়িয়াছে, তাহা বলা যায় না। সে নিশ্চয়ই তাঁহার উপরে নজর রাখিয়াছে, নিশ্চয়ই সে বোম্বাই হইতে পলায় নাই। সে ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত, তাহাকে চেনাও দুষ্কর। যে একবার এই টাকার লোভে খুন করিয়াছিল, সে আবার যে একটা খুন করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। টাকার জন্য সে অনায়াসে তাঁহাকে খুন করিবে, টাকা লইয়া পলাইবে—সে কি যথার্থই এই জাহাজে আসিয়াছে ?

জয়বন্ত তাঁহার সহযাত্রীদিগের প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া দেখিলেন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সেটা আছে, তাহা তাঁহার বোধ হইল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জয়বন্ত জাহাজের উপরে রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন যাত্রী আসিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি একটি চুরুট দিয়া বলিলেন, "খান্, খুব ভাল চুরুট।"

জয়বন্ত চুরুটটি লইয়া টানিতে লাগিলেন। কতক্ষণ তিনি জাহাজের উপরে ছিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না। সকালে দেখিলেন, তিনি কেবিনে শুইয়া আছেন—দরজা খোলা। তাঁহার সন্দেহ হইল, সত্বর উঠিয়া বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, নোটগুলি আছে। মনে মনে ভাবিলেন, "আশ্চর্য্য! রাত্রের কথা কিছুই মনে নাই। কখন জাহাজের উপর হইতে আসিয়া শুইয়াছিলাম, তাহার কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না।"

নবম পরিচ্ছেদ

ক্রোধের কারণ

জয়বন্ত বোম্বে হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই হরকিষণ দাসকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

"কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, কাল জাহাজে রওনা হইব। আশা করি, হিজন বন্দরে আসিবে।"

তাহাই হইয়াছে। হিজন বন্দরে আসিয়া জাহাজের প্রতীক্ষা করিতেছে। জাহাজ লাগিবামাত্র জয়বন্ত একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া লাফাইয়া তীরে নামিলেন; সত্বর হিজনের নিকটে আসিলেন। হিজন বাজী তাড়াতাড়ি গিয়া জয়বন্তের হাত চাপিয়া ধরিল। তাঁহাদের ন্যায় সুখী আজ কে? জয়বন্ত সত্বর একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। এবং হিজনকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজে উঠিলেন। উঠিয়া হরকিষণ দাসের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

পথে জয়বন্ত বলিলেন, "হিজন আমার মত সুখী আজ কে? আমার সঙ্গে সেই সব টাকা, সব কথা কি তোমার বাবা তোমায় বলিয়াছেন?"

"হাঁ, শুনিয়াছি না কি তুমি বাবার জন্য লাখ টাকা আনিতে গিয়াছিলে—সব পাইয়াছ?"

"সব—সব—এই বুকে কোটের ভিতরে আছে।"

"সত্য সত্যই লাখ টাকা আছে?"

"সত্য নয় ত কি মিথ্যা? এই বুকের কাছে হাত দিয়া দেখ।"

হিজন হাত দিয়া বলিল, "কাগজ?"

"হাঁ, সব নোট—হাজার টাকার একশতখানা নোট।"

"লাখ টাকা? ব্যাগে রাখ নাই কেন?"

"লাখ টাকার স্থান ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ নহে—বুক।"

"তাহা হইলে তুমি লাখ টাকাকে আমার অপেক্ষাও প্রিয় মনে কর, কেমন নয়?" হিঙ্গন পরিহাসের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

"না হিঙ্গন, তুমি ঐখানেই মস্ত ভুল করিয়াছ, তোমার স্থান বুকের উপরে নয়; ভিতরে—হৃদয়ের উপরে।"

হিঙ্গন বাঈ মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল—তাহারই হার হইয়াছে।

জয়বন্ত সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া অন্য সুরে বলিলেন, "হিঙ্গন, এই লাখ টাকারই জন্য আমাকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল।"

হিঙ্গন কহিল, "হাঁ, বাবা তাহাই বলিয়াছিলেন।"

"যাবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম।"

"কি বন্দোবস্ত?"

"তিনি কি তোমায় কিছু বলেন নাই?"

"কই—না?"

"যদি আমি তাঁহাকে এই লাখ টাকা আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন।"

হিঙ্গনের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

জয়বন্ত সোৎসাহে বলিলেন, "আর তোমাকে কে পায়, তুমি আজ হইতে আমার—আমার—আমার——"

হিঙ্গন কথা কহিল না। এইরূপ উন্মত্ততায়, আনন্দে, উৎসাহে জয়বন্ত নিজের প্রাণের হিঙ্গনের পার্শ্বে বসিয়া হরকিষণ দাসের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গাড়ীর শব্দ পাইয়া হরকিষণ দাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। লাখ টাকা সহজ ব্যাপার নহে! আর সেই লাখ টাকা যদি সহজেই জুটে, তবে তাহা পাইবার জন্য কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হইয়া উঠে, কাহার হৃদয় না সবেগে স্পন্দিত হইতে থাকে?

জয়বন্ত মহা উৎসাহে গাড়ী হইতে লাফাইয়া নামিলেন। হাত ধরিয়া আদরে হিঙ্গনকে নামাইলেন; বলিলেন, "কর্ত্তাজি, আজ হইতে হিঙ্গন আমার।"

তাহার পর সকলে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হরকিষণ দাসও আনন্দে উৎফুল্ল। বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়, সে টাকা কই?"

বুকে সবলে দুই-তিনবার চপেটাঘাত করিয়া জয়বন্ত বলিলেন, "এই বুকে—বুকে—বুকে——"

এই বলিয়া জয়বন্ত সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগটা এক পাশে ফেলিয়া দিয়া নিজের দেহ হইতে উপরের কোট খুলিয়া তাহাও দূরে ঘাসের উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; তাহার পর নীচের কোটটি খুলিয়া হরকিষণ দাসের হাতের উপরে সগর্ব্বে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "কাঁচি দিয়া নীচের অস্তরের কাপড়টা কাটিয়া ফেলুন; দেখিবেন, একশতখানা হাজার টাকার নোট কাগজে জড়ান রহিয়াছে, দেরী করিবেন না।"

কম্পিত হস্তে কাঁচি ধরিয়া হরকিষণ দাস অতি সন্তর্পণে কোটের অস্তরের কাপড় কাটিতে লাগিলেন, পাছে নোট কাটিয়া যায়। লাখ টাকা সহজ ব্যাপার নহে! কাপড় কাটিয়া হরকিষণ দাস কাগজ মোড়া একটা তাড়া টানিয়া বাহির করিলেন? কম্পিতহস্তে সত্বর উপরের কাগজখানা খুলিয়া ফেলিলেন। কই, নোট কোথায়—কাগজের ভিতরে একখানা পুরাতন সংবাদপত্র!

এ ব্যাপারে তাঁহাদের কি অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব!

সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও জয়বন্তের এরূপ অবস্থা হইত না। তিনি বিস্ফারিতনয়নে মুখব্যাদান করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। নোট—নোট—লক্ষ টাকার নোট কোথায়?

কয়েক মুহূর্ত্ত হরকিষণ দাসও স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান ছিলেন; ক্রোধে তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল। তিনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "এ কি ?"

জয়বন্ত কাগজের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে কথা নাই, নয়নে পলক নাই, এ কি ইন্দ্রজাল! তাঁহার পদনিম্নে যেন সমগ্র পৃথিবী সবেগে ঘুরিতে লাগিল।

হিঙ্গন বাঈ একবার বিবর্ণমুখে জয়বন্তের মুখের দিকে চাহিল; জয়বন্ত মহা অপরাধীর মত নিরুত্তরে রহিলেন। হরকিষণ দাস ক্রোধভরে বলিলেন, "কেমন—পথে চুরি করিয়া লইয়াছে—না?"

জয়বন্ত জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইলেন—তাঁহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "হাঁ।"

হরকিষণ দাস ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সেরূপ বিকট হাস্য সহজে কেহ হাসিতে পারে না। তিনি দক্ষিণ হস্ত বিস্তৃত করিয়া পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "দূর হও।"

হিঙ্গন পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "বাবা!"

হরকিষণ দাস গর্জ্জিয়া বলিলেন, "চুপ—এই বদমাইস, জুয়াচোরের কাছ থেকে সরে আয়।"

জয়বন্ত কেবলমাত্র বলিলেন, "আমি বদমাইস, জুয়াচোর——"

হরকিষণ দাস গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিলেন, "বদমাইস—জুয়াচোর—খুনী—তোমার এই পরম সৌভাগ্য যে, তোমাকে এখনও পুলিসে দিতেছি না। তোমাকে জেলে দেওয়াই উচিত।"

"জেলে দেওয়া——"

"হাঁ, আমার একশত টাকা জুয়াচুরি করিয়া লইয়াছ।"

হরকিষণ দাস আবার তাঁহাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আমাকে গাধা স্থির করিয়াছ, আমি যেন এ জুয়াচুরির কিছুই বুঝি না। আমি তোমার একটা কথা বিশ্বাস করি না—ওর কোটের কাপড়ের নীচে থেকে নোট অস্তে চুরি করিয়া লইল, আর উনি কিছুই জানিতে পারিলেন না; কি আশ্চর্য্য! সেই চোর আবার কোট সেলাই পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে!"

"আমি নিজে সেলাই করিয়াছিলাম।"

হরকিষণ দাস আবার মেঘগর্জ্জনবৎ বিকট হাস্ত করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এমন চোরকেও বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলাম। দূর হও, দূর হও—এখনই আমার চোখের সম্মুখ থেকে দূর হও; নতুবা আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না।"

দশম পরিচ্ছেদ

রমণী-হৃদয়

জয়বন্তের শিরায় শিরায় রক্ত খরপ্রবাহে ছুটিতেছিল, তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এত সাবধানতা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার কোট হইতে নোটগুলি চুরি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে খবরের কাগজ রাখিয়া দিয়াছিল। কখন কে এই সর্ব্বনাশ করিল, তিনি অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

হরকিষণ দাস ক্রোধে ফুলিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার কন্যা হিজন বাঈ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে ডাকিল, "বাবা!"

হরকিষণ দাস ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "সরে দাঁড়া, ঘরের ভিতরে যা, এখানে তোর থাকিবার আবশ্যকতা নাই।"

"বাবা!"

"আমি বলিতেছি, এখান থেকে চলিয়া যা। তুই আমার রক্তে জন্মিয়াছিস, এই রকম তস্করের কাছে থাকিবার তুই উপযুক্ত নহিস, যা ঘরের ভিতর যা।"

জয়বন্ত আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি কি মনে করিতেছেন, আমিই আপনার টাকা চুরি করিয়াছি?"

জয়বন্তের কণ্ঠস্বরে গভীরতর উদ্বেগ বেদনার আঘাত অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হিজন বাঈএর মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার নীলোৎপলতুল্য চক্ষু দুটি জলভারে অবনত হইয়া পড়িল।

হরকিষণ দাস দ্বিগুণ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "চোর—জুয়াচোর—বদমাইস——"

"আপনি মনে করিতে——"

"চুপ্ চোর।"

"আমি আপনার——"

"চোর—চোর।"

জয়বন্ত আর কোন কথা কহিলেন না, ফিরিলেন। তিনি দরজা পর্য্যন্ত গেলে হিঙ্গন আত্মহারা হইয়া, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

জয়বন্ত দাঁড়াইলেন, তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল. তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "হিঙ্গন, তুমিও কি আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছ?"

হিঙ্গন বাঈ তাহার স্নিগ্ধকরুণ চক্ষু দুইটি জয়বন্তের মুখের উপরে স্থির রাখিয়া বিচলিতস্বরে কহিল, "না—না—না, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করি না; নিশ্চয়ই কেহ টাকা চুরি করিয়াছে।"

"আমি জানি, তুমি অবিশ্বাস করিবে না।"

"না—না—নিশ্চয়ই কেহ টাকা চুরি করিয়াছে।"

হরকিষণ দাস বলিয়া উঠিলেন, "আমার নিজের মেয়ে আমার কথা শোনে না?"

হিঙ্গন আবার ডাকিল, "বাবা!"

হরকিষণ দাস বলিলেন, "ঘরের ভিতরে যা, শীঘ্র যা, এই জুয়াচোরকে আর প্রশ্রয় দিতে আছে।"

হিঙ্গন বাঈ মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, "বাবা, আপনি অন্যায় বলিতেছেন।"

হরকিষণ দাস অধীর হইয়া কহিলেন, "আমার নিজের মেয়ে আমার

অন্যায় দেখে, আমার নিজের মেয়ের মুখে এই কথা!" ক্রোধে হরকিষণ দাস আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

জয়বন্ত হিঙ্গনকে বলিলেন, "তোমার বাবা অনর্থক রাগ করিতেছেন, আমি এখনও চেষ্টা করিলে সে নোট পাইব। সে নোট লইয়া আসিব, তখন তোমায় আমি পাইব—এই জুয়াচোর তখন সাধু হইবে। এখন আর কোন কথা বলিব না—হিঙ্গন, আমি চলিলাম।"

হিঙ্গন কথা কহিল না, তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিল।

জয়বন্ত বলিলেন, "নোট বোম্বাই সহরে চুরি যায় নাই, আমি এখন বুঝিয়াছি, নোট জাহাজেই খোয়া গিয়াছে; সুতরাং যে চুরি করিয়াছে, সে জাহাজেই আসিয়াছে, এখনও পোর-বন্দরে আছে, ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। আমি যেমন করিয়া হয়, তাহাকে ধরিবই ধরিব। হিঙ্গন তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর?"

"আমি কখনও তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই।"

"তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আজ হউক, আর কাল হউক, আমি ফিরিয়া আসিব, তখন তোমার বাবা বুঝিবেন যে, তিনি আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছেন, আমায় অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন।"

হরকিষণ দাস কি বলিতে যাইতেছিলেন। এবার জয়বন্ত তাঁহাকে কিছু বলিতে দিলেন না, তিনি আঘাতের উপরে আঘাত পাইয়া ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন; আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিবন্ধক দিয়া কহিলেন, "আপনি যথেষ্ট বলিয়াছেন, আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ জীবনে এরূপ কটু কথা আমি আর কখনও শুনি নাই। তাহার জন্য আমি আপনার উপরে কিছুমাত্র রাগত হই নাই; বরং আমার নিজের আহাম্মুখীর জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি, যাহা

ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার উপরে সন্দেহ করা বা এরূপ রাগ প্রকাশ করা অন্যায় নহে। আমার উপরে এখন সন্দেহ হইতেছে, কিন্তু যাহাতে এ সন্দেহ দূর হয়, যাহাতে আপনার টাকা, আপনার হাতে আনিয়া দিতে পারি, আমি তাহা করিবই করিব—তবে আমার নাম জয়বন্ত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিব। যদি না পারি, আর আমি ফিরিব না—এ মুখ এ সংসারে আর কাহাকেও দেখাইব না—ঈশ্বর আমার সহায় হউন—আমার জীবনে এমন ভয়ানক দিন আর কখনও আসে নাই।"

এই বলিয়া কোট ছুটা আবার গায়ে চড়াইয়া, ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া জয়বন্ত বিষাদবিদীর্ণহৃদয়ে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহাকে সেরূপভাবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া হিঙ্গনের প্রাণে কি কষ্ট হইল—তাহা হিঙ্গনই জানে। হিঙ্গন তাঁহার অনুসরণ করিল। বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখে—এক বৃক্ষতলে একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তরের উপরে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জয়বন্ত বসিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে, হিঙ্গন বাঈ পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইল। দুইহাতে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া স্নিগ্ধকরুণস্বরে বলিল, "বল জয়বন্ত, সত্যই কি তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিলে।"

জয়বন্ত নিরুত্তর।

হিঙ্গন জয়বন্তকে নীরব দেখিয়া আকুল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,"বাবা অত্যন্ত রাগী—বল আমাকে ক্ষমা করিলে; আমি বাবাকে বুঝাইব। যখন সে নোট চুরি গিয়াছে, তখন তাহা আর ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম—বল, তুমি নোট না পাইলেও এখানে ফিরিবে।"

এবার জয়বন্ত বলিলেন, "না হিঙ্গন, নোট না পাইলে আর ফিরিব

না—এই পর্য্যন্ত—তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে নোট আমি ঠিকই উদ্ধার করিয়া আনিব, আমার মনে কিছুমাত্র দুরভিসন্ধি নাই—ঈশ্বর অবশ্যই আমার সহায় হইবেন। হিঙ্গন, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও—আবার শীঘ্র দেখা হইবে। আমি এখন উঠিলাম।"

এই বলিয়া জয়বন্ত উঠিলেন; পথের দিকে চলিয়া গেলেন; এক-বারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না—চিত্রিত আলেখ্যবৎ হিঙ্গন যাই যতক্ষণ জয়বন্তকে দেখা গেল, ততক্ষণ সেইদিকে অশ্রুপ্লাবিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টি রোধ করিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া হিঙ্গন আবার চাহিল—জয়বন্ত নাই—অদৃশ্য হইয়াছেন।

জয়বন্ত যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাহিরের পথে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সেই গাড়ীতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আবার পোর-বন্দরে রওনা হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার ছদ্মবেশের প্রয়োজন

সেদিন যখন পুলিস আসিয়া জয়বন্তকে পড়োবাড়ীর গহ্বর হইতে উদ্ধার করিল, তখন মেটা প্রথমে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়াছিল; কিন্তু বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই সে দাঁড়াইল। কি ভাবিল, তৎপরে চোরের ন্যায় সংগোপনে আবার সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেই বাড়ীর সমস্ত গুপ্তপথ তাহার জানা ছিল; সে পা টিপিয়া টিপিয়া, যেখানে পুলিসের লোক দড়ী ফেলিয়া দিয়া জয়বন্তকে টানিয়া তুলিতেছিল, তাহারই নিকটে এক জায়গায় অন্ধকারে লুকাইয়া রহিল।

জয়বন্ত পুলিসকে যাহা বলিলেন, তাহাও সে শুনিল। তখন সে বুঝিল যে, জয়বন্ত তাহাকে একদম বোকা বানাইয়াছে। সে যথার্থ পুলিসের লোক হইলে কখনই পুলিসের লোকের সম্মুখে এরূপভাবে কথা কহিত না, নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় দিত, তাহার সম্বন্ধেও সকল কথা বলিত। এখন মেটা বুঝিল যে, জয়বন্ত আদৌ পুলিসের লোক নহেন; মিথ্যা সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছে। জয়বন্ত তাহারই মত একজন জুয়াচোর, কোনগতিকে এই লাখ টাকার সন্ধান পাইয়া তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে, হয় ত টাকাগুলি হস্তগত করিয়াছে। নিজে ভয় পাইয়া পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর মত তাহাকে সকল কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা জয়বন্ত খুনের কথা বা কোন কথাই জানিতে পারিত না।

সেই রাত্রেই মেটা বোম্বাই ফিরিল। সে জানিত, পর দিন কখনই জয়বন্ত বোম্বে হইতে পলাইতে পারিবে না। তাঁহার বাসার ঠিকানা সে

জানিত। প্রথম দিন এই বাসার ঠিকানা দিয়া জয়বন্ত তাহার নিকটে চাকরী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সেই রাত্রে মেটা নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিল। অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইয়া ভোর হইতে-না-হইতে ফোর্টে চলিল, তথায় একটা দোকান ছিল, সেই দোকানে থিয়েটরের নানাবিধ সাজ বিক্রয় হইত। ইহারা থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীগণকে নানাবিধ সাজে সাজাইয়া দিয়া থাকে ও পোষাক ভাড়াও দেয়।

দোকান খুলিবামাত্র মেটা দোকানে গিয়া দোকানদারের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল," আমি যাহা চাহি, আপনি শুনিয়া বোধ হয়, আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। হয় ত আপনাদের দ্বারাও আমার কাজ হইবে না।"

দোকানদার বলিল, "কি আপনার আবশ্যক ?"

"আমি এমনই ছদ্মবেশ ধরিতে চাহি যে, আমার নিজের ছেলে আমাকে যেন চিনিতে না পারে।"

"আপনার ছেলে ?"

"হাঁ, বলিতে কষ্ট হয়, আমার ছেলে আমার যথা-সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। আমি পুলিসে খবর দিতে পারিতেছি না, তাহা হইলে সে জেলে যায়, পিতা হইয়া ছেলেকে কিরূপে জেলে দিব ? সেই-জন্য ছদ্মবেশে তাহার অনুসন্ধান করিতে চাহি। আমাকে চিনিতে পারিলে সে নিরুদ্দেশ হইবে।"

"তাহা হইলে আপনি কি করিতে চান ?"

"আপনারা আমার চেহারার এমন পরিবর্ত্তন করিয়া দিন যে, অন্ততঃ তাহা এক সপ্তাহ থাকে। এক সপ্তাহের কমে আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইব না।"

"এক সপ্তাহ ?"

"আপনি কি মনে করেন, এক সপ্তাহ কোন ছদ্মবেশ থাকিবে না? এই দেখুন, আমার সব দাঁত বাঁধান, এটা খুলিয়া লইলে এমনই আপনা হইতেই চেহারার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়," বলিয়া মেটা মুখ হইতে কৃত্রিম দন্তপংক্তি দুইটি খুলিয়া লইল।

দোকানদার বলিল, "হাঁ, ইহাতে মুখের অনেক পরিবর্ত্তন হয়— মুখটা অনেক গুটাইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি।"

"তাহার পর চুল——"

"তাহা একেবারে সাদা করিয়া দিতে পারি; কিন্তু সে সাদা আর যাইবে না, পরে কলপ লাগাইতে হইবে।"

"তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, প্রস্তুত আছি।"

"শরীরের রংটাও অনেক কাল করিয়া দিতে পারি।"

"সে রং কি পরে উঠিবে?"

"হাঁ, দিন কত ভাল করিয়া সাবান লাগাইলে ক্রমে উঠিয়া যাইবে।"

"ভাল, তাহার পর আর কি?"

"একটু কষ্ট হইবে——"

"কি কষ্ট, আমি ছেলের জন্য সব কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত আছি।"

"এই নাকে একটা শোলা গুঁজিয়া দিলে নাকটা মোটা ও চেপ্টা দেখিতে হইবে।"

"খুব ভাল।"

"ইহাতে কথার সুরও একটু বদল হইবে। বিশেষতঃ দাঁত না থাকায় কথা ও স্বরেরও পরিবর্ত্তন হইবে।"

"খুব ভাল।"

"তাহার পর কোটের নীচে একটা ছোট বালিশ দিয়া কুঁজো হইতেও অনায়াসে পারিবেন।"

"ইহা আরও ভাল।"

"ইহার উপরে যদি আপনি একটা খোঁড়া লোকের একজোড়া বাঁকা জুতা পায়ে দেন, তাহা হইলে আপনার ছেলেও আপনাকে চিনিতে পারিবে না। বাঁকা জুতার জন্ত আপনার পা-ও আপনা হইতে ঠিক খোঁড়া লোকের মত পড়িবে।"

"আপনি এখনই আমাকে কি এরূপ করিয়া দিতে পারেন?"

"এখনই?"

দরদস্তর ঠিক হইল। মেটা টাকা দিল, দোকানী তাহাকে ভিতরের ঘরে লইয়া গেল।

একঘণ্টা পরে মেটা যখন সেই দোকান হইতে বাহির হইল, তখন তাহার চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে চেনা কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

মেটা তথা হইতে বরাবর যে বাড়ীতে জয়বন্ত বাসা লইয়াছিলেন, তথায় আসিল. সেটা বাসাড়ে বাড়ী, বিদেশিগণ আসিয়া এক-একটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করে। মেটার সৌভাগ্যক্রমে জয়বন্তের পার্শ্বের ঘর-খানিই খালি ছিল। মেটা তাহা ভাড়া লইল।

বোম্বের অধিকাংশ বাড়ীর ঘরের ভিতরের প্রাচীর কাষ্ঠনির্ম্মিত, এ বাড়ীরও তাহাই ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠের সকল বিষয় দেখিবার জন্ত মেটা একখানি ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া সেই কাঠের প্রাচীরে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র করিল। তখন জয়বন্ত বাসায় ছিলেন না। তিনি তখন দন্ত-চিকিৎসক পাটেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

মেটা এখন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল যে, যতক্ষণ.না নোটগুলি হস্তগত হয়, ততক্ষণ সে তাঁহার উপরে নজর রাখিবে; প্রয়োজন হয়, তাঁহাকে খুন করিবে। এই

নোটের জন্য সে একবার একজনকে অবলীলাক্রমে খুন করিয়াছিল, আবার যে একজনকে খুন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! সুবিধা পাইলেই সে যে এই কাজ করিবে, মনে মনে তাহা স্থির করিয়া, তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়া অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখিয়াছিল।

জয়বন্তের গৃহের দরজায় কেবল শিকল দেওয়া আছে, চাবি দেওয়া নাই, ইহা দেখিয়া মেটা বুঝিল যে, নোট যদি জয়বন্ত পাইয়া থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন, এ ঘরে রাখিয়া যান নাই। লাখ টাকার নোট কেহ এরূপভাবে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দেয় না।

এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের নিকটে কাহার পদশব্দ হইল। মেটা সত্বর উঠিয়া গিয়া প্রাচীরের ছিদ্রে চক্ষু লাগাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্য—লক্ষ টাকা

জয়বন্ত গৃহমধ্যে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে পকেট হইতে একটা থাম বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে এক-এক করিয়া একশতথানি নোট সম্মুখে রাখিলেন। নোটগুলি দেখিয়া মেটা উন্মত্ত-প্রায় হইল। এই সেই লক্ষ টাকার নোট!

মেটা ভাবিল, তাহা হইলে এই দুরাত্মা যথার্থই ফাঁকী দিয়া নোট-গুলি নিজে হস্তগত করিয়াছে। ভয় পাইয়া তাঁহার নিকটে ডাক্তারকে জাহাজে খুন করিবার কথা স্বীকার করিয়া কি আহাম্মুখীই হইয়াছে। নতুবা এখন অনায়াসে তাঁহার নিকট হইতে নোটগুলি সংগ্রহ করা যাইতে পারিত। এখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি খুনী বলিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবেন, সুতরাং সে উপায় আর নাই। মেটা মহা-বিভ্রাটে পড়িল।

মেটা দেখিল, জয়বন্ত নোটগুলিকে একখানি সাদা কাগজে বেশ করিয়া মুড়িয়া একটি বাণ্ডিল করিলেন। কিরূপ আকারের কত বড় বাণ্ডিল মেটা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিয়া লইল। তাহার পর সে দেখিল যে, জয়বন্ত কোটের অন্তরের কাপড় কাটিয়া ফেলিয়া নোটের বাণ্ডিলটি কোটের কাপড়ের নীচে রাখিলেন, রাখিয়া সূচ ও সূতা লইয়া তাহা সেলাই করিয়া ফেলিলেন। জয়বন্ত কোটের কাপড়ের নিম্নে নোটগুলি রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না; তিনি সেই কোটটি পরিলেন। তাহার উপরে আর একটা কোট পরিয়া বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন; মেটা কিন্তু তাহার ঘর হইতে নড়িল না। ঘণ্টাখানেক পরে জয়বন্তজী আবার ফিরিয়া আসিলেন, অমনি মেটা আবার প্রাচীরের রন্ধ্রপথে দৃষ্টিসংযোগ করিল।

এবার মেটা দেখিল যে, জয়বন্ত জাহাজের একখানা টিকিট লইয়া আসিয়াছেন। মেটা যথাসাধ্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই টিকিটখানা পড়িবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। এবারও সৌভাগ্য তাহার সহায় হইল। টিকিটখানা হাতে করিয়া জয়বন্ত কি লইবার জন্য মেটা যে প্রাচীরে চক্ষু লাগাইয়া বসিয়াছিল, সেইদিকে আসিলেন। সেই অবসরে মেটা টিকিটে জাহাজের নামটা পড়িয়া লইল। আরও দেখিল, জাহাজ কাল প্রাতেই ছাড়িয়া যাইবে।

এখন কি করা কর্ত্তব্য, মেটা তাহাই ভাবিতে লাগিল। রাত্রে নিশ্চয়ই জয়বন্ত ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিবেন, তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—বিশেষতঃ মেটা দেখিল, জয়বন্তের নিকটে পিস্তল রহিয়াছে; খুব সম্ভব, টাকার জন্য তিনি আজ রাত্রে আদৌ নিদ্রিত হইবেন না। যতক্ষণ তিনি জাহাজে না উঠিতেছেন, ততক্ষণ তিনি নিরাপদ নহেন, নিশ্চয়ই মনে মনে জয়বন্ত ইহাই ভাবিতেছেন, সুতরাং এখানে আজ রাত্রের মধ্যে কোনমতে নোটগুলি হস্তগত করিবার উপায় নাই।

মেটা ঘর হইতে বাহির হইল। জয়বন্তের ঘরের দরজা তখন খোলা ছিল, জয়বন্ত তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিলেন, মেটার পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে চাহিলেন; মেটাও তাহাই চাহে, জয়বন্ত তাহাকে কোনরূপে চিনিতে পারেন কি না, তাহাই দেখা তাহার উদ্দেশ্য। জয়বন্ত তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, একবারমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

মেটা তখন সত্বর সেই জাহাজের আফিসে গেল। তাহার ইচ্ছা, জয়বন্ত যে কেবিনের টিকিট লইয়াছেন, সেই কেবিনের অন্য টিকিটখানি নিজে লইবে ; কিন্তু তাহার সে আশা নিষ্ফল হইল। শুনিল, সে কেবিনে অন্য কাহারও যাইবার স্থান নাই।

মেটা দুঃখিত হইল ; কিন্তু উপায় নাই। আগেকার মত এবার এক কেবিনে যাইতে পারিলে জয়বন্তের অবস্থা ডাক্তারের ন্যায় করিতে তাহার ক্ষণবিলম্ব হইত না ; কিন্তু উপায় নাই। তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্য কেবিনে যাইতে হইল ; যাহা হউক, জাহাজেই একটা উপায় করিয়া নোটগুলি হস্তগত করিতেই হইবে। মনে মনে ইতোমধ্যেই মেটা একটা মৎলব স্থির করিয়া ফেলিল।

সে জাহাজের আফিস হইতে বাহির হইয়া এক বাক্স খুব ভাল চুরুট কিনিল, তৎপরে এক ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা মর্ফিয়ার আরকও ক্রয় করিল। এই সকল সংগ্রহ করিয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল ; আসিয়া দেখিল, তখনও জয়বন্ত তাঁহার দ্রব্যাদি বাঁধিতেছেন ও বাড়ী-ওয়ালার সহিত হিসাব মিটাইতেছেন।

সে রাত্রে মেটা কিছুই করিবার সুবিধা পাইল না। সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল। জয়বন্ত খুব ভাল করিয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ; কিন্তু তিনি আলো নিবাইলেন না, বিছানায় বসিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। মেটা বুঝিল, জয়বন্ত আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকাই স্থির করিয়াছেন। আজ রাত্রে কোন সুবিধাই হইবে না।

মেটা রাত্রের মধ্যে দুই-তিনবার উঠিয়া ছিদ্র দিয়া দেখিল, জয়বন্ত সেই একইভাবে বসিয়া বই পড়িতেছেন। রাত্রে আর কিছু হইবে না ভাবিয়া, মেটা শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল।

অতি প্রাতে মেটা উঠিল। জয়বন্ত গাড়ী ডাকিতে বলিতেছেন শুনিয়া, সে সত্বর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে আসিয়া এক-খানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মেটা সত্বর জাহাজে গিয়া উঠিল।

জাহাজে তাহার উপস্থিত হইবার পর প্রায় আধঘণ্টা পরে জয়বন্ত জাহাজে আসিলেন। তিনি মেটাকে দেখিলেন, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। মেটার পরিবর্ত্তে তিনি একজন কুব্জখঞ্জ বৃদ্ধ মারাঠী ভদ্রলোককে দেখিলেন।

রাত্রে মেটা জাহাজের ডেকের উপরে তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিল; ইহাতেও জয়বন্ত তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। মেটা তাঁহাকে একটা চুরুট দিল।

মেটা পূর্ব্বেই মরফিয়া আরকে চুরুট ভিজাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া-ছিল, চুরুটটা দুই-চারিবার টানিতে-না-টানিতে জয়বন্তের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিল, তাঁহার হাত হইতে চুরুট স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মেটা চুরুটটি কুড়াইয়া লইয়া সমুদ্রে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, তৎপরে জয়বন্তের হাত ধরিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে তুলিল। জয়বন্ত অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় মেটার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মেটা তাঁহাকে তাঁহার কেবিনে আনিয়া শোয়াইয়া দিল। জয়বন্ত শয়ন করিবামাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তখন মেটা সত্বর উঠিয়া কেবিনের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সংজ্ঞা-শূন্য জয়বন্তের কোটের বোতাম খুলিয়া ফেলিল; তৎপরে নিজের পকেট হইতে কাঁচি, সূচ, সূতা বাহির করিল, তাহার ব্যস্ত হইবার বা তাড়া-তাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে জানিত, সমস্ত রাত্রের মধ্যে জয়বন্তের চেতনা হইবে না।

সে কোটের কাপড় কাটিয়া নোটগুলি বাহির করিয়া লইল। সে

আগে হইতেই খবরের কাগজ দিয়া একটি বাণ্ডিল করিয়াছিল, কোটের নীচে নোট যেরূপ ছিল, সেইরূপভাবে সেই বাণ্ডিলটি রাখিয়া আবার কোটের কাপড় সেলাই করিয়া দিল। তখন সে জয়বন্তকে সেই অবস্থায় রাখিয়া, কোনদিকে কেহ নাই দেখিয়া, নিজের কেবিনে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মত সুখী কে? সে যে টাকার জন্য এত ভয়াবহ কাজ করিয়াছিল, এতদিনে সেই টাকা তাহার হস্তগত হইয়াছে! আর তাহাকে পায় কে? সে আজ হইতে বড়লোক। হরকিষণ দাস নাই, আর কেহ এ টাকার জন্য গোল করিবে না। এক জয়বন্ত, সে নিজেও টাকা চুরি করিতেছিল, চোরের উপর বাটপাড়ী হইয়াছে, কে চুরি করিয়াছে, জানিতে পারিবে না। আর জানিলেই বা কি? সে তাহার কি করিবে? টাকা হাতে আসিলে কি না হয়?

সে নিজের কেবিনে আসিয়া নিজের দুই জুতার সুকতলা তুলিয়া তাহার নিম্নে নোটগুলি রাখিয়া দিল। এখানে নোট আছে, কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না।

পর দিবস প্রাতে জয়বন্ত কেবিনের দরজা খোলা রহিয়াছে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু কোটের নীচে নোটগুলি ঠিক সেই অবস্থায় আছে দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন। তাঁহার নোট যে চুরি গিয়াছে, সে বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিলেন না।

তিনি হিজনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহযাত্রী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। জাহাজ তীরে লাগিবামাত্র লম্ফ দিয়া নামিলেন, হিজনের সহিত দেখা করিতে ছুটিলেন।

তাহার পর যাহা হইয়াছে, বলা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আক্রমণ

বিষণ্ণমুখে হতাশচিত্তে জয়বন্ত পোর্-বন্দরে ফিরিলেন। আকাশ হইতে নিমেষমধ্যে তিনি যেন গভীর সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইলেন। কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই বিলীন হইয়া গেল। আর কি সে নোট তিনি ফিরিয়া পাইবেন ?

হিঙ্গনের সম্মুখে তিনি বলিয়াছিলেন, যেরূপেই হউক, নোট বাহির করিবেনই করিবেন, নোট আনিয়া হরকিষণ দাসকে দিবেন ; কিন্তু এখন স্থির হইয়া ভাবিতে সময় পাইয়া বুঝিলেন যে, এ কাজ সহজ নহে। তিনি সন্দেহ করিতেছিলেন যে, মেটা নোট চুরি করিয়াছে ; কিন্তু মেটা জাহাজে আসে নাই।

তিনি নোট হস্তগত হওয়া অবধি সেদিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলেন, তিনি কেবল জাহাজে একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন ঘুম তাঁহার কেন হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এখনও বুঝিতে পারিলেন না, তবে এইটুকু বুঝিলেন, যদি চুরি হইয়া থাকে—চুরি ত নিশ্চয়ই হইয়াছে, তাহা হইলে যখন তিনি জাহাজে দরজা খোলা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়েই চুরি হইয়াছে। তবে কে চুরি করিল ? তিনি অনেক ভাবিয়াও এ বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। জয়বন্তের মস্তিষ্ক এখনও বিকৃত—পৃথিবীর সমুদয়ই এখনও তাঁহার কাছে গোলমাল বিশৃঙ্খল।

কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমেই হউক বা হিঙ্গনের সৌভাগ্যক্রমেই হউক, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তিনি পোর-বন্দরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একটি বন্ধুর বাড়ী যাইতেছিলেন; তথায় কয়েকদিনের জন্য বাস করিবেন, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি একটি লোকের উপরে পড়িল। লোকটি একজন ধনাঢ্য বেণিয়ার গদী হইতে বাহির হইয়া একখানা গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া জয়বন্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! তিনি কি করিবেন, কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই সেই লোকটি গাড়ীসহ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

জয়বন্ত দেখিলেন, জাহাজে যে তাঁহাকে চুরুট দিয়াছিল, যাহাকে কুঁজো খোঁড়া বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, এ সেই লোক; কিন্তু এখন সে ততটা কুঁজো বা খোঁড়া নহে। তখনই তাঁহার মনে হইল যে, এ আর কেহ নহে, মেটা জাহাজে ছদ্মবেশ ধরিয়া তাঁহার চোখে ধূলি দিয়া তাঁহার পকেট হইতে নোট চুরি করিয়াছে।

হায় হায়, তাহাকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিলাম! অনায়াসে তাহাকে ধরিতে পারিতাম। যাহা হউক, উপায় নাই, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ করিয়া ফল নাই। এখনও সে পোর-বন্দরে আছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—আজ কখনই বোম্বাই রওনা হইতে পারিবে না, যেমন করিয়া পারি, তাহাকে ধরিতেই হইবে।

এখানে নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী মেটা একখানা নোট ভাঙাইবার জন্য আসিয়াছিল। দেখা যাক্, এই লোকের নিকটে কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না। এইরূপ ভাবিয়া জয়বন্ত সেই গদীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনিই মালিক?"

"হাঁ, কি প্রয়োজন?"

"আমি বোম্বাই সহরের একজন ডিটেক্‌টিভ-কর্ম্মচারী।"

"আমার কাছে কি প্রয়োজন?"

"আমি একটি লোকের অনুসরণে নিযুক্ত আছি, চোরাই নোট তাহার নিকটে আছে, হাজার টাকার এক-একখানা? আপনার কাছে একখানা ভাঙাইয়াছে বুঝি?"

"না, ভাঙাইতে আসিয়াছিল বটে, আমি বিশেষ সন্ধান না লইয়া বেশি টাকার নোট বদ্‌লাই করি না।"

জয়বন্ত পকেট হইতে নোট-বই বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন দেখি, সে নোটের নম্বর ইহাতে আছে কি না?"

মালিক একটা নম্বর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এইখানা।"

"কি নাম বলিয়াছে?"

"বাইরামজী মেটা—বোম্বাইএর উকীল।"

"নোট কি ফেরৎ লইয়া গিয়াছে?"

"না, আমার কাছে জমা রাখিয়া গিয়াছে। তাহার খরচে বোম্বাইএ টেলিগ্রাফ করিতে বলিয়াছে, সেখানকার ব্যাঙ্ক হইতে উত্তর আসিলেই তাহাকে টাকা দিব।"

"এমন কাজও করিবেন না, এ সব চোরাই নোট, আমার কাছে সংবাদ না পাইয়া কিছুই করিবেন না। আমরা এখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করিব। এখানে সে কোথায় আছে,কোন ঠিকানা বলিয়াছে?"

"হাঁ, ধর্ম্মশালায় আছে।"

"এখন এই পর্য্যন্ত।"

এই বলিয়া জয়বন্ত তাঁহার গদী হইতে বাহির হইয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন; কোচ্‌ম্যানকে বলিলেন, "তীরের মত চালাইয়া যাও, বক্‌শিস দিয়া খুসী করিব।"

গাড়ী তীরবেগে ছুটিল। তিনি ধর্ম্মশালায় আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, মেটা তখনও ফিরিয়া আসে নাই। সে কোন্ ঘরে আছে জানিয়া, জয়বন্ত পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে বাসা লইলেন।

তখন তাঁহার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। তাঁহার হৃদয় এত সবলে স্পন্দিত হইতেছিল যে, যেন তাঁহার বুক ভাঙিয়া যাইবে। আজ কি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন? নোটগুলি কি আবার তাঁহার হাতে ফিরিয়া আসিবে? তিনি কি সেই নোট লইয়া ফিরিতে পারিবেন—ফিরিয়া হিঙ্গনকে দেখিতে পাইবেন?

যদি মেটা এখানে আর না ফিরিয়া আসে? না নিশ্চয়ই ফিরিবে, তাহার দ্রব্যাদি এখানে রহিয়াছে,এ সকল ফেলিয়া কি সে চলিয়া যাইবে? না—না—সে নিশ্চয়ই আসিবে। বহুক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় জয়বন্ত গৃহমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া মেটার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রায় সন্ধ্যার সময়ে মেটা ফিরিয়া আসিয়া নিজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। জয়বন্ত নীরবে সন্তর্পণে গৃহমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। চারি-দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহ নাই, তিনি নিঃশব্দে মেটার গৃহে প্রবেশ করিয়া নিমেষমধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন; কি হইয়াছে, কে আসিয়াছে, তাহা মেটা বুঝিবার পূর্ব্বেই সিংহ-বিক্রমে জয়বন্ত তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দুই হস্তে সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। হতাশে, নৈরাশ্যে, ক্ষোভে ক্রোধে জয়বন্তের দেহে এখন সিংহের বল সমাগত।

মেটা বিস্ফারিতনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে একটিও শব্দ করিতে পারিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় জয়বন্তের হাত গলা হইতে সরাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু জয়বন্ত আজ উন্মত্ত, তাঁহার শরীরে অসুরের বল, তিনি দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া মেটার কণ্ঠে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে মেটা নিস্তেজ হইয়া আসিল, অবশেষে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। জয়বন্ত ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কাপড় দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া তিনি মেটার বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, বুক সবলে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, তাহা হইলে মরে নাই! তিনি আশ্বস্ত হইলেন। এই নরাধম নররাক্ষসকে হত্যা করিলেও পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে, তিনি নরহত্যা করিতে প্রস্তুত নহেন—সে খুনী, তাই বলিয়া তিনি খুনী হইবেন কেন?

তিনি মেটার জামার বোতামগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার পকেটে এক খামের মধ্যে নোটগুলি পাইলেন। সবগুলিই আছে—কেবল একখানা নোট নাই।

মেটার পকেটে আর এক পয়সাও নাই। জয়বন্ত বুঝিলেন যে, মেটার নিকটে ফিরিয়া যাইবার ভাড়া থাকিলে সে কখনই এখানে একখানা নোট ভাঙাইবার চেষ্টা পাইত না। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই সে নোট ভাঙাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল।

জয়বন্ত নোটগুলি নিজের পকেটে পূরিয়া প্রথমে দ্বার ঈষৎ খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, কোনদিকে কেহ নাই; তিনি সত্বর সে কক্ষ-ত্যাগ করিলেন। তৎপরে সাবধানে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এ নোট আর কিছুতেই সঙ্গে রাখা উচিত নহে; কি জানি, যদি আবার চুরি যায়। প্রথমবার যেরূপে তাঁহার নিকট হইতে চুরি গিয়াছিল, তাহাতে কিছুই বিশ্বাস নাই। তিনি ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পোর-বন্দরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদীয়ান লালুভাই চবিলদাসের গদীতে উপস্থিত হইলেন।

চবিলদাসের সহিত দেখা করিয়া জয়বন্ত বলিলেন, "মুনিয়াদের হরকিষণ দাসের নিরনব্বই হাজার টাকার নোট আমি আপনাদের গদীতে

তাঁহার নামে জমা দিতে চাহি। আর এ সংবাদ যেন আজ রাত্রেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"

"এ টাকা তাঁহার?"

"হাঁ, তাঁহার এক মামী বোম্বাই সহরে ছিলেন, তিনি মারা যাওয়ায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরকিষণ দাস পাইয়াছেন; আমি সেই টাকা আনিবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিলাম।"

"একেবারে হরকিষণ দাসকে না দিয়া আমাদের গদীতে জমা দিতেছেন কেন?"

"বিশেষ কাজ থাকায় আজ রাত্রে আমি তাঁহার বাড়ী যাইতে পারিব না। এত টাকা সঙ্গে রাখা নিরাপদ নয় বলিয়া আপনাদের গদীতে জমা দিতেছি।"

"বেশ, আমরা আজ রাত্রেই তাঁহাকে সংবাদ দিব।"

গদীতে নোট জমা দিয়া নিয়মিত রসিদ লইয়া জয়বন্ত কতক আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, আর চুরি যাইবার ভয় নাই। গদীতে নোট খোয়া গেলে, এখন লালুভাই চবিলদাস দায়ী হইবেন। তাঁহার ক্রোড় টাকার অধিক সম্পত্তি।

পোর-বন্দরের প্রধান উকীল শ্যামজীদাসকে জয়বন্ত চিনিতেন। জয়বন্ত এখন তাঁহার নিকটে চলিলেন, এখনও একখানা নোট বেহাত আছে—যেমন করিয়া হয়, সেখানাও তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। হরকিষণ দাস তাঁহার মক্কেল বলিয়া, শ্যামজী দাস জয়বন্তকে সমাদরে বসাইলেন।

জয়বন্ত বসিয়া বলিলেন, "হরকিষণ দাসের একটা কাজের জন্যই আপনার কাছে আসিলাম।"

"কি বলুন, হরকিষণ সাহেবের কাজে আমি সর্ব্বদাই নিযুক্ত আছি।"

"বোধ হয়, আপনি শুনেন নাই যে, বোম্বাই সহরে হরকিষণ দাসের এক মামী ছিলেন।"

"হাঁ, একটা মোকদ্দমায় এই মামীর কথা একবার শুনিয়াছিলাম।"

"তিনি সম্প্রতি মারা গিয়াছেন।"

"তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হরকিষণ দাস।"

"বটে, খুব সুখের বিষয়। কত সম্পত্তি ছিল ?"

"সমস্ত বিক্রয় করিয়া লাখ টাকা হইয়াছে।"

"তিনি সে টাকা পাইয়াছেন ?"

"সেইজন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"বলুন।"

"আমি এই টাকা বোম্বাই হইতে আনিবার জন্য যাই, সেখান হইতে একশতখানা হাজার টাকার নোট লইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু জাহাজে এই নোট সমস্তই চুরি যায়। আমি অনেক চেষ্টায় একখানা ছাড়া আর সমস্ত নোটই উদ্ধার করিয়া এখন লালুভাই চবিলদাসের গদীতে জমা করিয়া দিয়াছি—এই তাঁহাদের রসীদ।"

উকীল মহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ ঠিক আছে।"

"এখন একখানা নোট সেই চোর ভাঙাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল।"

"কোথায় ?"

যেখানে যেটা নোট ভাঙাইতে গিয়াছিল, জয়বন্ত তাহা বলিলেন। সেখানে তিনি যেরূপ বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া বলিলেন, "যাহাতে এই চোর নোটখানা আর হস্তগত করিতে না পারে, তাহা আপনাকে করিতে হইবে।"

"হরকিষণ দাস কি এখানে আসিয়াছেন ?"

"না. তিনি বাড়ীতে আছেন।"

"এখানে তাঁহার একবার আসা দরকার হইতেছে।"

"আপনারাই তাঁহাকে পত্র লিখুন।"

"কেন ?"

"তাঁহার বিশ্বাস, আমিই তাঁহার টাকা চুরি করিয়াছি। জাহাজে এই লাখ টাকাই খোয়া গিয়াছিল; কিন্তু একটু আগে আমি এক হাজার টাকা ব্যতীত আর সমস্ত টাকাই তাঁহার নামে লালুভাই চবিলদাসের গদীতে জমা করিয়া দিয়াছি।"

"ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি না আসিলে এ হাজার টাকা অপরে দাবী করিলে চলিবে না।"

"তাহা হইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য এখনই সংবাদ দিন।"

"কাজেই,আজ রাত্রে তিনি যাহাতে নোট ফেরৎ না দেন,সে বিষয়ে যাহা করিতে হয়, আমি এখনই করিতেছি। কাল সকালে হরকিষণ দাস আসিয়া পৌঁছিলেই তাঁহার নোট তিনি পাইবেন।"

"দেখিতেছি, তাহা হইলে কাল সকালে আমাকে আপনার নিকটে আসিতে হইবে।"

"নিশ্চয়।"

"তাহাই আসিব।"

জয়বন্ত বিদায় হইলেন। তিনি রাত্রে পোর-বন্দরে থাকিবার বন্দোবস্তের জন্য বহির্গত হইলেন। আবার তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হিঙ্গনের সম্মুখে গিয়া আবার উজ্জলমুখে দাঁড়াইতে পারিবেন, এ তাঁহার পক্ষে কম আনন্দ নহে—দশ লক্ষ টাকায় এ আনন্দ নাই—তাঁহার সমস্ত মন আজ পরিপূর্ণ—বিশ্বপৃথিবী, অনন্ত গগন, সমস্ত জগৎ-সংসার তাঁহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

মেটা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কেবল কণ্ঠে অতিশয় বেদনা অনুভূত হইতেছিল।

সে হাতের উপরে ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তখন তাহার জ্ঞান হইল যে, সে পোর-বন্দরের ধর্ম্মশালায় রহিয়াছে। এবং এইখানেই কে সহসা আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। তাহার পর তাহার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল।

সহসা সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নোটের কথা মনে পড়িল, সে উন্মাদের ন্যায় পকেটে হাত পূরিয়া দিল। তৎপরে বিকট চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! পকেটে নোট নাই!

ক্রোধে সে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল—সে প্রকৃতই উন্মাদ হইয়া গেল; এত করিয়াও—হাতে পাইয়াও হারাইলাম, এই কথা যতই তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অগ্নি ছুটিতে লাগিল। সে কিয়ৎক্ষণ পাগলের ন্যায় সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে উন্মত্তবেগে ছুটিতে লাগিল।

ক্রমে তাহার মস্তিষ্ক কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে, কি করা তাহার উচিত। পুলিসে সংবাদ দিবে—তাহা কি উচিত? তাহা হইলে তাহার সকল কথাই প্রকাশ

হইয়া পড়িবে। না, তাহা কখনই করা উচিত নহে। নোটগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই ঠিক; না, তাহা করিবারও উপায় নাই। যাহার নোট তিনি পাইয়াছেন, বলিয়া ব্যাঙ্কে পত্র লেখা হইয়াছে, এখন অন্য কথা লিখিলে অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে; অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। না, ইহা করাও অসম্ভব! তবে কি সকল পরিশ্রম পণ্ড হইল, হাতে নোটগুলি আসিয়াও হারাইল?

তাহার নিকট হইতে কে নোটগুলি লইল? এ নোটের কথা কেহ জানে না, তবে কে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া নোটগুলি লইল? জয়বন্ত যে এ কাজ করিয়াছেন, তাহা তাহার মাথায় একবারও প্রবেশ করিল না।

যাহা হউক, এখনও হাজার টাকার একখানা নোট বেণিয়ার কাছে আছে, এখানা সে এখনই হস্তগত করিবে, তাহার পর বাকীগুলির অনুসন্ধান করিবে, সে সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহাও স্থির করিল।

মেটা তখনই ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া বেণিয়ার গদীতে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মালিক বলিল, "কি, দেখিতেছি একা ফিরিয়া আসিয়াছ?"

মেটা বলিল, "কেন? আপনাকে ত আগেই বলিয়াছি, আমার এখানে পরিচিত লোক কেহ নাই।"

"তাই বটে, তবে এখানে তোমার কয়েকজন বন্ধু আছে, তাহারা তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে?"

"বন্ধু—সে কি—আমার এখানে কোন বন্ধু নাই! আপনি বোম্বাই হইতে টেলিগ্রামের উত্তর পাইয়াছেন কি?"

"না, আমি টেলিগ্রাফ করি নাই, আমি বাজে খরচে রাজী নহি।"

"সে কি?"

"তুমি চলিয়া গেলেই একজন তোমার বন্ধু তোমার অনুসন্ধানে এখানে আসে——"

"আমার বন্ধু !"

"হাঁ, তোমাকে তিনি খুব চেনেন। তিনি বলিলেন, 'এইমাত্র যিনি গেলেন ; তিনি আমার বন্ধু উকীল মেটা সাহেব।'"

"কি—কি—বলিল ?"

"যাহা বলিলাম, তিনি চোরাই নোটের অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি যে, তুমি একা আসিয়াছ।"

"একা !"

"হাঁ, তিনি বলিলেন যে, তিনি আজই তোমায় অনুগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার করিবেন।"

"গ্রেপ্তার !"

"হাঁ, চোরেদের ঐ ব্যবস্থাই হয়।"

"চোর !"

"হাঁ, চোর বই কি।"

"ও বদ্‌মাইসী আমার সঙ্গে চলিবে না। আমার নোট আমাকে ফেরৎ দাও।"

"তোমার নোট ?"

"হাঁ, শীঘ্র আমার নোট আমায় ফেরৎ দাও।"

মালিক ফিরিয়া তাঁহার একজন লোককে বলিলেন, "যাও, এখনই পুলিস ডাকিয়া আন।"

মেটা ভীতভাবে বলিল, "পুলিস ?"

"হাঁ গো মহাশয়, পুলিস।"

"তোমার মৎলব কি ?"

"ব্যস্ত হইয়ো না, পুলিস যতক্ষণ না আসে, এইখানে অপেক্ষা কর, তাহারা আসিলেই সব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবে। আমি বুড়ো মানুষ, আর কত বকিব? আর তাহারা এ সকল বিষয় আমাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারে।"

"এর জন্য তোমাকে রীতিমত শিক্ষা দিব।"

এই বলিয়া তিন লম্ফে তীরবেগে মেটা তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। দুইজন কনেষ্টবলকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া মেটা ভয়ে এক ক্ষুদ্র গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

তাহার বাক্স ধর্ম্মশালায় রহিয়াছে, আগে সে ধর্ম্মশালার দিকে ছুটিল। সে বুঝিল যে, পুলিস তাহার অনুসরণ করিতেছে, আর ক্ষণবিলম্ব করিলে তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পড়িল।

সত্বর তাহার বাক্সটি তাহার নিজের বগলে তুলিয়া বাহির হইতেছিল, এই সময়ে সে দেখিল, ধর্ম্মশালার দ্বারে একজন পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর আর কয়েকজন কনেষ্টবল দণ্ডায়মান।

বোধ হয়, তখন রাত্রি আটটা, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, এখনও পুলিস তাহাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু এখনই তাহারা তাহার অনুসন্ধানে বাড়ীর ভিতরে আসিবে, দরজায়ও পাহারা রাখিবে, সুতরাং সে ধরা পড়িবে, তাহার রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই।

সম্মুখের দরজা দিয়া পলাইবার উপায় নাই। মেটা বাক্স ফেলিয়া ব্যাকুলভাবে পলাইবার অন্য কোন পথ আছে কি না দেখিবার জন্য বাড়ীর চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকল জানালাতেই লৌহ-গরাদে দেওয়া, বিশেষতঃ সে যেখানে রহিয়াছে, সে উচ্চ একতল—সিঁড়ী দিয়া পুলিস উঠিতেছে।

পার্শ্বে একটি অনত্যুচ্চ ক্ষুদ্র ছাদ ছিল। উন্মত্তের মত ব্যাকুলভাবে মেটা সেই ছাদে আসিল। মনে করিল, এ ছাদ তত উচ্চ নহে, এখান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে পারিবে। কিন্তু এ অবস্থায় কাহারই বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকে না—মেটা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িল।

তৎপরে এক বিকট চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যেখানে মেটা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইখানে একটা ইঁদারা ছিল। অন্ধকারে মেটা তাহা দেখিতে পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল, ভূতলে পড়িয়া পলাইতে সক্ষম হইবে,কিন্তু সে ভূতলে না পড়িয়া—ভূগর্ভে গভীর কূপের ভিতরে পড়িল। যখন সে বুঝিল যে, সে কোথায় যাইতেছে—কোথায় পড়িতেছে, তখন এমনই বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, সেই ভয়াবহ চীৎকারে ধর্ম্মশালার সমস্ত লোকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

পুলিস প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ধরিতে আসে নাই, তাহার কথা তাহারা কিছুই জানিত না। কয়দিন পূর্ব্বে ধর্ম্মশালায় একটা চুরি হওয়ায় তাহারা সেই অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিল। পাপাত্মা মেটা ঘটনাচক্রে পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাইল।

শব্দ শুনিয়া সকলে ইঁদারার নিকটে সমবেত হইল। একটা লোক যে তাহার ভিতরে পড়িয়াছে, তাহা অনুমানে কতক বুঝিল।

পুলিস অন্যান্য লোক ডাকিতে কনেষ্টবলকে পাঠাইল। অনেক কষ্টে কয়েকজন লোক কূপের ভিতরে নামিয়া গিয়া মেটার মৃতদেহ টানিয়া উপরে তুলিল।

পাপীর দণ্ড হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পুণ্যের জয় হইল

বলা নিষ্প্রয়োজন, সেদিন জয়বন্তের প্রস্থানের পর হরকিষণ দাসের বাড়ী নিতান্ত আনন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত হিঙ্গন ম্রিয়মাণ—বড় একটা পিতার সম্মুখে আসে নাই। হরকিষণ দাসও একদিকে নীরবে বসিয়া আছেন, কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না।

জয়বন্ত চলিয়া গেলে তাঁহার ক্রোধ ক্রমে উপশমিত হইল, তখন তিনি মনে মনে লজ্জিত হইলেন। সহসা এরূপ রাগ করা যে উচিত হয় নাই,তাহা হরকিষণ বুঝিলেন ; বিশেষতঃ জয়বন্ত যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে দোষী বা অপরাধী বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে ক্রোধভরে তিনি এ সকল কিছুই ভাবিয়া দেখিতে অবসর পান নাই—কথার উপরে কথা কহিয়া তাঁহাকে একটা কথাও বলিতে দেন নাই।

তিনি ভাবিলেন, "নোট যদি কোনগতিকে চুরি না যাইত, তাহা হইলে জয়বন্ত কখনই এরূপভাবে কেবল মজা করিবার জন্য কোটের নীচে খবরের কাগজ সেলাই করিয়া আনিত না। নিশ্চয়ই মোট চুরি গিয়াছে, আর সে যদি নিজে চুরি করিত, তাহা হইলে মোটেই আর ফিরিয়া আসিত না। আমি নোটের বিষয় কিছুই জানিতাম না, তাঁহার কিছুই করিতে পারিতাম না।"

রাত্রি হইয়াছে, হরকিষণ দাস গৃহমধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা পত্র দিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরকিষণ দাস নামসাক্ষর ব্যতীত লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। তাঁহার লেখাপড়ার কার্য্য পূর্ব্বে গোপালদাস করিত, তাহার পর জয়বন্ত করিতেন, তিনি বোম্বে গেলে তাঁহার কন্যাই সে কাজ করিতেছিল, কন্যা হিঙ্গন বেশ লেখাপড়া জানিত।

পত্র পাইয়া হরকিষণ দাস কন্যাকে ডাকিলেন, "হিঙ্গন!"

কন্যা বলিল, "বাবা!"

"এদিকে এস!"

কন্যা আসিলে তাহাকে পত্রখানা দিয়া হরকিষণ দাস বলিলেন, "কে লিখিয়াছে, দেখ।"

হিঙ্গন পত্রখানি খুলিয়া পড়িল;—

"শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আপনার নামে আমাদের গদীতে নিরনব্বই হাজার টাকার নোট জমা হইয়াছে। জয়বন্ত লালজীভাই আপনার নামে এই টাকা জমা দিয়াছেন। আপনি ইচ্ছামত যখন হয়, এ টাকা গদী হইতে লইয়া যাইবেন, অথবা আজ্ঞা করেন ত আমাদের গদীতেই জমা রাখিতে পারি, আপনি নিয়মিত সুদ মাসে মাসে পাইবেন।

বশংবদ

লালুভাই চাবিলদাস।"

পত্র শুনিয়া হরকিষণ দাস লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। হিঙ্গনের দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। হিঙ্গন গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমি বলিয়াছিলাম ত।"

হরকিষণ দাস সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমার পাগড়ী কোট দাও, আমি এখনই পোর-বন্দরে যাইব।"

"কেন বাবা, রাত্রে কি টাকা——"

(বাধা দিয়া) "টাকার জন্য নয়। আমি জয়বন্তকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার কাছে হাজারবার ক্ষমা চাহিব। তাহার ঠিকানা কি?"

"তাহা আমি জানি না, বাবা।"

"জানি না!"

"তিনি যখন টাকা পাইয়াছেন, তখন নিজেই আসিবেন।"

"না—না—তাহাকে আমি চোর বলিয়াছি, সে সে রকম লোক নয় যে, না ডাকিলে আসিবে।"

"বাবা!"

"আমি সেখানে যাই, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এখানে আনিব।"

এই সময়ে আর একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। [illegible]বণ দাস বলিলেন, "এ আবার কে? কি মুস্কিল! পড়।"

হিঙ্গন পড়িল ;—

"শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আপনার যে নোট চুরি গিয়াছিল, তাহারই একখানি নোট একজন চোর এখানকার এক বেণিয়ার নিকটে ভাঙাইতে যায়, আপনার কন্যা জয়বন্ত লালজীভাই অনুরোধ করায় আপাততঃ আমরা সে নোট আটক করিয়াছি। এক্ষণে আপনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই সে নোট পাইবেন।

বশংবদ

শ্যামজী দাস

পত্র পাঠ করিয়া হিঙ্গন মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা, আপনার লাখ টাকাই আপনি পাইবেন।"

হরকিষণ দাস নিজের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন. "হিঙ্গন, আর আমাকে লজ্জা দিস্ না, মা!"

পর দিবস অতি প্রাতে হরকিষণ দাস পোর-বন্দরের দিকে রওনা হইলেন।

* * * * *

আমরা যাহাদের জীবনের একাংশ বর্ণন করিলাম, তাহাদের বিষয় আর কি কিছু বলিতে হইবে?

এই সকল ঘটনার তিন বৎসর পরে কেহ যদি হরকিষণ দাসের বাড়ী যাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, হরকিষণ দাস একটি সুন্দর শিশুকে স্কন্ধে করিয়া তাহার সহিত খেলা করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

[illegible]হার, তাহাও কি বলিতে হইবে? এমন কি স্বয়ং হিঙ্গন [illegible] তাহার ক্ষুদ্র পুত্র বৃদ্ধ মাতামহের স্কন্ধ হইতে কিছুতেই নামে না।

হরকিষণ দাস এই পুষ্পকলিকাবৎ শিশুটিকে পাইয়া বিষয়-কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। জামাতা জয়বন্ত এখন সর্ব্বেসর্ব্বা।

হরকিষণ দাসের সংসার এখন আনন্দপূর্ণ। আগে কেবল বিষয় কর্ম্মের গোলযোগে চব্বিশঘণ্টা কাটিত, এখন তাহার ঠিক মাঝখানে শান্তিদেবী আসন পাতিয়াছেন।

সমাপ্ত।